৮.০৫ দুর্ধর্ষ জাভেদ – Bangla Library

৮.০৫ দুর্ধর্ষ জাভেদ – Bangla Library

৮.০৫ দুর্ধর্ষ জাভেদ

দুর্ধর্ষ জাভেদ — ১২৫

ক্যাপ্টেন আরফিন দুই চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছিলেন। দূরে বহুদূরে সাগরবক্ষে ঢেউয়ের বুকে কালো রঙের একটা কিছু ভেসে যাচ্ছে। জিনিসটা কি বোঝ না গেলেও ক্যাপ্টেন হুই আন্দাজ করে নিলেন ঐ বস্তুটি একটি চারকোনা বাক্স। তিনি জাহাজখানাকে ঐ বস্তুটির দিকে নেবার জন্য জাহাজের চালককে নির্দেশ দিলেন।

জাহাজ এলুন এগিয়ে ক্যাপ্টেন হুইয়ের নির্দেশমত চললো সেই কালো বস্তুটার দিকে।

জাহাজের সকলেরই বিপুল আগ্রহ জাগছে না জানি ওটা কি এবং তার মধ্যে কি থাকতে পারে!

ক্রমান্বয়ে জাহাজ, এলুন সেই বিস্ময়কর বস্তুর নিকটবর্তী হতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে সাগরবক্ষের উত্তাল তরঙ্গ কিছু শান্ত ছিলো এবং আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দীর্ঘ সুঠামদেহী সুপুরুষ। তিনি আঠারো বছর বয়স থেকে জাহাজ ভাসিয়ে সাগরের বুকে পাড়ি জমিয়েছেন। কত অজানা দেশ আবিস্কার করেছেন। কত না বিপদে পড়েছেন তিনি অজানা দেশ আবিস্কার করতে গিয়ে। কিন্তু এমন তো কোনো দিন দেখেননি। আজ সাগরবক্ষে একটি বিস্ময়কর বাক্স তার মনে ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কতক্ষণে তিনি বাক্সটা জাহাজে তুলে নিতে সক্ষম হবেন সেটাই হলো এখন তার একমাত্র চিন্তা।

ক্যাপ্টেন হুইয়ের কন্যা মিস লুসি পিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলো একটা বই নিয়ে। খুব ভালো লাগছিলো তার বইখানা পড়তে। বইটা ছিলো কোন নাবিকের জীবন কাহিনী।

মিস লুসি বইয়ের মধ্যে যখন ডুবে ছিলো তখন হঠাৎ একজন নাবিক এসে জানালো– মিস লুসি, সাগরবক্ষে একটি বাক্সের মত পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার মধ্যে কোনো বিস্ময়কর বস্তু থাকতে পারে। আমাদের জাহাজখানা এখন সেই বস্তুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নাবিকের মুখে কথাটা শুনে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটে এসেছে সে পিতার পাশে। আশ্চর্য কণ্ঠে বলেছিলো মিস লুসি-বাবা, ওটা কি?

ক্যাপ্টেন হুই কন্যার কথায় বলেছিলেন–তুমি আর আমি একই স্থানে দাঁড়িয়ে, কাজেই আমার মনেও তোমার মতই প্রশ্ন জাগছে ওটা কি?

মিস লুসি বাবার হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে লাগালো, তারপর ভালভাবে লক্ষ্য করে বললো——আমার মনে হয় ওটা কোনো জলযান এবং তা অকেজো হয়ে উল্টে গেছে।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–হাঁ, আমার ধারণাও তাই।

ঐ বাক্সের মত বস্তুটা ততক্ষণে অতি নিকটে এসে যাচ্ছে এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন কি খালি চোখেও দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

নাবিকগণ তখন ভাসমান বস্তুটা জাহাজে উঠিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।

ক্যাপ্টেন হুই ও তার কন্যা মিস লুসি এগিয়ে এলো ডেকের ধারে। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো সবাই মিলে।

সবার মনেই বিপুল উন্মাদনা না জানি ওর মধ্যে কি আছে?

জাহাজের নাবিকগণ তুলে আনলো সেই বিস্ময়কর বাক্সটা।

জাহাজের ডেকে তখন সবাই জড়ো হয়েছে।

বাক্সটা জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হলো।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখলো ক্যাপ্টেন হুই ও তার সঙ্গীসাথিগণ। বিরাট বাক্সটার চারদিকে শিকল দিয়ে আটকানো।

এবার বাক্সটা খুলে দেখার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো কিন্তু খুলবে কি করে। বাক্সের চারপাশে আটকানো শিকল ভাঙা মোটেই সহজ নয়। ক্যাপ্টেন আরফিন নিজে একটা বড় সাঁড়াশি নিয়ে বাক্সটার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মিস লুসি বললো–বাবা, তুমি কেন কষ্ট করবে? আমাকে সাঁড়াশিটা দাও……

হাসলেন ক্যাপ্টেন হুই কন্যা লুসির কথায়।

সাঁড়াশি দিয়ে বাক্সের শিকল কেটে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। অন্যান্য সবাই তাকে সাহায্য করছে।

ক্যাপ্টেন হুইয়ের কানে তখনও কন্যার কথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে.....বাবা, তুমি কেন কষ্ট করবে? আমাকে সাড়াশিটা দাও......

লুসি আজ বড় হয়েছে, বুকভরা তার সাহস। অবশ্য শক্তিও বেশ আছে লুসির শরীরে। ও এখন সব বুঝতে শিখেছে, বাবার কষ্ট ওর হৃদয়ে আঘাত করে, কারণ জন্মাবার পর হতেই লুসি তার বাবাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে দেখে আসছে। ক্যাপ্টেন হুই বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। ছোটবেলার কাহিনী লুসি তার বাবার মুখে শুনেছে খুব দুঃখ হয় লুসির, তার বাবা কত অসহায় ছিলেন!

একদিন মিস লুসি জিজ্ঞাসা করেছিলো তার বাবাকে, বাবা, জ্ঞান হবার পর হতে তোমাকেই শুধু দেখে আসছি, আমার কি আর কেউ নেই?

কন্যার কথায় সেদিন ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের মনটা চড়াৎ করে উঠেছিলো, যদিও ক্যাপ্টেন হুই জানতেন একদিন তার শিশু কন্যা বড় হবে, তারপর জ্ঞানলাভ করবে, হয়তো বা তাকে জিজ্ঞাসা করে বসবে, বাবা, আমার কি তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। যে কথাটা ক্যাপ্টেন হুইয়ের মনে উঁকিঝুঁকি দিতো সত্যি একদিন লুসি তা বলেই বসলো।

লুসির কথায় সেদিন ক্যাপ্টেন হুই আনমনা হয়ে পড়েছিলো, চট করে কোনো জবাব দিতে পারেননি, কারণ লুসির প্রশ্নটা তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিলো। মুহূর্তে অনেকগুলো স্মৃতি ভেসে উঠেছিলো সেদিন তার মনের পর্দায়। ঐ মুখ...... লুসির মুখ তার মায়ের মুখ স্মরণ। করিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন হুইয়ের চিন্তাধারা চলে যায় দূরে অনেক দূরে...অতীতের এক কাহিনী জেগে ওঠে মনের পর্দায়। আরফিন হুই তখন এক জাহাজে নাবিকের কাজ করতেন। বয়স তখন তার বিশ-বাইশ হবে, সুঠাম সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, জাহাজের ক্যাপ্টেন তাকে পছন্দ করতেন, ভালও বাসতেন। অবশ্য কারণ ছিলোহই বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী ছিলেন। মোল বছর বয়সে হুই জাহাজে কাজ নিয়েছিলেন অনেক দুঃখকষ্টের পরে।

বিশাল সমুদ্র আর বিস্তৃত আকাশ আরফিন হুইয়ের মনকে মাঝে মাঝে আনমনা করতে, মাটির আস্বাদ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি। এ পৃথিবীতে কেই বা আছে তার। সমুদ্র আর আকাশকেই ভালবাসতেন হুই, তার সবচেয়ে আপনজন এরা। মনটা যখন খুব চঞ্চল হয়ে উঠতো তখন ফাঁকা ডেকে এসে দাঁড়াতেই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন অথৈ পানির সঙ্গে নীল আকাশের আলিঙ্গন।

শুধু আকাশ আর সমুদ্র।

এ ছাড়া আর কিছুই যে দেখতে পেতেন না তখন।

একদিন সাইক্লোনের মুখে পড়লো তাদের জাহাজখানা। সে কি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর ঝড়। হুই এমন ঝড় এই প্রথম দেখলেন। এর পূর্বে নাবিকদের মুখে সাইক্লোনের অনেক গল্প শুনেছেন। সাইক্লোন সামুদ্রিক ঝড়! ভীষণ এক রাক্ষসীর ঝাক যেন তাড়া করে আসে চারদিক থেকে।

আরফিন হুই সেদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

একে বয়স কম।

বাইশ বছর বয়স, এমন কিইবা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার!

পূর্বাকাশ জমাট অন্ধকারে ভরে উঠতেই জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকের মুখ শুকিয়ে গেলো। কে যেন সবার মুখে কালিমা লেপন করে দিলো। একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো সবার চোখেমুখে। আরফিন ভড়কে গেলেন, এরা এমন করছে কেন! সবার মধ্যেই একটা আতঙ্কের ভাব। ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে।

ক্যাপ্টেন হুই সেদিন জানতেন না তাদের জাহাজখানা এক ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। বুঝলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই, হাজার হাজার রাক্ষসী যেন একসঙ্গে তাদের জাহাজখানাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। সমুদ্র এক ভীষণ আকার ধারণ করলো, প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো ভীষণভাবে ছুটে আসছে জাহাজের উপরে।

আকাশটা যেন নেমে এসেছে মাথার ওপরে।

কারও কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই।

সবাই জাহাজটাকে রক্ষা করবার জন্য প্রচেষ্টা চালাছে, ওরা যেন লড়াই করছে সাইক্লোনের সঙ্গে।

জাহাজখানা মোচার খোলের মত দুলছে।

প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে জাহাজের লণ্ঠনগুলো নিভে গেছে।

একটা ভয়ংকর জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই, অন্ধকারে গড়াগাড়ি যাচ্ছে জাহাজের তেলের ড্রামগুলো। হেডলাইট অকেজো হয়ে পড়েছে। জাহাজখানা এলোপাতাড়ি ছুটছে দিশেহারার মত।

আরফিন হুইয়ের জীবনে প্রথম সাইক্লোন ঝড়। সে ঝড়ের দাপটে কোথায় কুঁকড়ে পড়ে আছেন তা নিজেই জানেন না। জানেন না তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন।

পরদিন ভোরে চোখেমুখে সূর্যের আলো এসে পড়তেই আরফিন হুই চোখ মেলে তাকালেন। সূর্যের আলোতে প্রথমে চোখ খুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। প্রথমেই আলোঝলমল নীল আকাশে আর হালকা মেঘ চোখে পড়লো। মনে পড়লো গত রাতের কথা, সত্য তিনি তাহলে বেঁচে আছেন! হুই ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, তার কানে ভেসে এলো ক্যাপ্টেনের গলা। আরও অন্যান্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন সেদিন হুই। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলেন জাহাজখানার পেছন ডেকে পড়ে আছেন। কালকের সেই প্রচন্ড ঝড় তাদের জাহাজখানাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। তবু ভাগ্য যে জাহাজখানা সাগরের অতলে তলিয়ে যায়নি। তাহলে আজ আর সূর্যের আলো দেখা তার হতো না।

আরফিন হুই টলতে টলতে উঠে এগিয়ে এলো সামনের ডেকের দিকে।

দূর থেকে ক্যাপ্টেন ও তার সঙ্গীরা আরফিন হুইকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, সবার অবস্থাই করুণ! একটি রাত্রি তাদের জীবনটাকে যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। ওরা আরফিন হুইকে দেখামাত্র বলে উঠলেন- বেচারা তাহলে ভেসে যায়নি? বেঁচে আছে

আরফিন তার নিজের দেহটার দিকে তাকালেন।

সত্যি তিনি বেঁচে আছেন!

ক্যাপ্টেন পিঠ চাপড়ে দিলেন আরফিনের, তিনি খুব খুশি হয়েছেন তাকে জীবিত দেখে। সাইক্লোনটা অসহায় আরফিন হুইয়ের জীবনটা তাহলে ভিক্ষা দিয়ে গেছে।

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি জানালো।

কিন্তু বেশীক্ষণ ওকে নিয়ে ভাববার সময় এখন নেই। রাতের তান্ডবলীলা তাদের জাহাজখানাকে কোথায় এনে ফেলেছে কে জানে। জাহাজের সবকিছু লন্ডভন্ড হলেও মানুষগুলো বেঁচে আছে, তবে একজন নাবিকের পা তেলের ড্রামের নিচে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। সে এখন বেদনায় সংজ্ঞাহারা অবস্থায় একটি ক্যাবিনে পড়ে আছে। তাকেও দেখবার মত সময় এখন কারও নেই, কারণ জাহাজখানা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলে এসেছে দূরে বহু দূরে।

ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য নাবিক লক্ষ্য করেছে বেশ দূরে গভীর জঙ্গলের মত কিছু নজরে পড়ছে। তবে কি তারা কোনো অজানা দেশে এসে পড়েছে?

ক্যাপ্টেন জাহাজখানাকে তীর অভিমুখে এগিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেন।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আরফিন হুই।

তার চোখেমুখে বিস্ময়।

এ আবার কোন দেশে তারা এসে পড়লেন। হুই ভাবছেন যা নতুন একটা দেশ দেখা যাবে। ইতিপূর্বে জাহাজে নাবিকের কাজ নেয়ার পর অনেক দেশে যাবার সৌভাগ্য তার হয়েছে। বহু আশ্চর্য জিনিস এবং জীবজন্তু দেখেছেন। দেখেছেন নতুন নতুন মানুষ।

অনেক কিছু ভাবছিলেন আরফিন হুই।

এক সময় তাদের দৃষ্টিতে অতি নিকটে মনে হলো তীরটা। গভীর জঙ্গল, মাঝে মধ্যে টিলা আর ছোটবড় পাহাড়। জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে।

বহুদিন পর মাটির ছোঁয়া পাওয়া গেলো।

বেশ ভাল লাগলো আরফিন হুইয়ের।

কতদিন হলো তার পা দু’খানা মাটি স্পর্শ করেনি। মাটির গন্ধ তাকে বিমোহিত করেনি তবে কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে উঠছিলো তার কাছে জাহাজখানা।

অতি নিকটে এসে পড়েছে তীরটা।

বালুগুলো চকচক্ করছে, মনে হচ্ছে রাশি রাশি মণিমুক্ত ছড়ানো আছে। এত বিপদের মধ্যেও খুশি লাগছে হুইয়ের।

জাহাজখানা এক সময় তীরে ভীড়লো।

একেবারে কিনারে ভিড়ানো তো সম্ভব নয়, তাই কয়েক রশি দূরে জাহাজ নোঙ্গর করলো। ক্যাপ্টেন অন্যান্য নাবিক সহ বোটনৌকায় নেমে পড়লেন কিন্তু তীর ছেড়ে তারা যেমনি জঙ্গলের দিকে এগুতে যাবে অমনি অসংখ্য পাথরের নুড়ি এসে পড়তে লাগলো তাদের দেহে এবং আশেপাশে।

ক্যাপ্টেন বললেন—আর বিলম্ব নয়, উঠে পড়ো। শিগগির পালাতে হবে। জঙ্গলে অসভ্য জংলীরা বাস করে, তারা আমাদের আক্রমণ করেছে..

ক্যাপ্টেন নিজেও উঠে পড়লেন এবং তার সঙ্গী-সাথীরাও বোট-নৌকায় উঠে জাহাজের দিকে অগ্রসর হলো।

এবার অসংখ্য জংলী বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে এবং তীরে দাঁড়িয়ে তারা পাথর ছুঁড়তে লাগালো বোটগুলোর দিকে।

ভাগ্যিস তারা তাড়াতাড়ি বোটে উঠে পড়েছিলেন তাই রক্ষা নইলে দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়তে এবং মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

কোনোরকমে সবাই এসে জাহাজে উঠে পড়লো।

তখনও জংলীরা পাথরের নুড়ি ছুঁড়তে লাগল অবিরাম।

ক্যাপ্টেন জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলেন, কারণ জংলীরা সাঁতার কেটে আক্রমণ চালাতে পারে।

দু'দিন দু'রাত তারা দিশেহারার মত জাহাজ চালিয়ে এক বন্দরের নিকটে পৌঁছে গেলো তৃতীয় দিনে।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলো জাহাজের নাবিকগণ।

তার সঙ্গে আরফিন হুইয়ের খুশিও কম নয়।

বন্দরে অবতরণ করার পর ওরা যেন নতুন জীবন ফিরে পেলো। বন্দরটির নাম আরাকান বন্দর।

ক্যাপ্টেন বললেন এই শহরে তারা এক সপ্তাহ থেকে যাবেন।

কথাটা শুনে সবার মনে খুশীর উৎস বয়ে চললো। মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হলো সবাই। যে যে দিকে পারলো ছড়িয়ে পড়লো ওরা। কেউ ক্লাবে, কেউ হোটেলে কেউ বা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভাল করে দেশটা দেখতে লাগলো, উপভোগ করতে লাগলো শহরটার সৌন্দর্য।

আরাকান ভারী সুন্দর শহর!

এখানের মানুষগুলো পুতুলের মত সুন্দর।

আরফিন হুই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

হঠাৎ পথের মধ্যে দেখা হলো এক আরাকান যুবতীর সঙ্গে। সে গায়ে পড়ে আলাপ জামালো আরফিনের সঙ্গে, আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলো তার বাড়িতে।

যুবতীর নাম এলিনা।

সুন্দরী বটে, ডাগর দুটি নীল চোখ। রাশিকৃত কোঁকড়ানো চুল। হাল্কা পাতলা গড়ন। মুখে মিষ্টি হাসি। খুব ভাল লাগলো হুইয়ের তাই তার আমন্ত্রণকে অবহেলা করতে পারলো না।

ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে অভিভূত হলেন আরফিন হুই, কেমন যেন মোহমুগ্ধ হয়ে পড়লেন তিনি।

জাহাজে ফিরে আসা আর হলো না আরফিন হুইয়ের। এলিনাকে বিয়ে করলেন তিনি। এলিনাও পছন্দ করেছিলো আরফিন হুইকে। তার সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা ওকে আকৃষ্ট করেছিলো।

আরফিন হই আরাকানবাসী হয়ে গেলেন।

দীর্ঘ দুটি বছর কেটে গেলো ওদের।

জন্ম নিলো নতুন আগন্তুক-একটি কন্যাসন্তান।

এলিনা আর দুই কন্যার নাম রাখলো লুসি।

কিন্তু লুসিকে আদর-স্নেহ দেবার জন্য এলিনা বেশীদিন পৃথিবীর বুকে টিকে রইলো না। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এলিনা পরপারে চলে গেলো। লুসি আর মিঃ হুইকে দেখবার মত আরাকান শহরে কেউ ছিলো না।

লুসিকে বুকে নিয়ে আরফিন হুই বেরিয়ে পড়লো।

কোথায় যাবেন তিনি জানেন না।

ফিরে যান তিনি নিজের দেশ ম্যানোলায়। কিন্তু সেখানেও তার মন টিকলো না। সমুদ্র T: আর আকাশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আরফিন হুই লুসিকে তার এক ফুফুর কাছে রেখে জাহাজে ফিরে এলেন। নাবিক হুইয়ের মন যখন কন্যার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতো তখন আকাশ আর সমুদ্রের মায়া ত্যাগ করে ছুটে আসতেন ম্যানোলায়। লুসি তখন পা পা হাঁটতে শিখেছে, বাবাকে দেখে উঠিপড়ি করে দৌড়ে আসতো।

নাবিক হুই ঘামে ভেজা শরীরে কন্যা লুসিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতেন ওর নরম কচি গাল দুটো।

দুদিন পর আবার ফিরে যেতেন তার কাজে।

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেলো।

লুসি স্কুলে পড়াশোনা করে।

বাবা আসে, লুসি বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা প্রশ্ন করে।

আরফিন হুই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। আবার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারেন। তখন লুসি খুশীতে দীপ্ত হয়ে ওঠে।

এমনি করে দিন কাটছিলো।

বৃদ্ধা ফুফু হঠাৎ একদিন হার্টফেল করলেন। তার হার্টের অসুখ ছিলো বহুদিন ধরে।

লুসিকে একা রেখে কাজে যাওয়া যায় না। ওকে দেখবার কেউ ছিলো না তাই আরফিন দুই কন্যা লসিকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর কার্যস্থলে।

সেই থেকে লুসি আজও তার বাবার সঙ্গে রয়েছে।

আরফিন হুই এখন আর নাবিক নন, তিনি এখন ক্যাপ্টেন হই। এ জাহাজের মালিক তিনি। আকাশ আর সমুদ্র নিয়েই তার জীবন। লুসি তার সাথী। বাবাকে সে একটুও কষ্ট করতে দিতে চায় না। ও মনে করে, এ পৃথিবীতে তার একমাত্র বাবাই পরিচিত এবং আপনজন। একটা কিছু তার হয়ে গেলে লুসি আর বাঁচবে না।

লুসি নিজে বাবাকে অনেক সাহায্য করে।

সুদীর্ঘ দিন লুসি জাহাজে বাবার সঙ্গে আছে, কাজেই সে এখন একজন দক্ষ নাবিকও বটে।

লুসি বাবার হাতের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো–সাঁড়াশিটা আমার হাতে দাও বাবা, আমি ঐ বাক্সটার শিকল কেটে ফেলি।

ক্যাপ্টেন আরফিন বললো–মা লুসি, তুমি মিছামিছি কষ্ট করতে যাবে কেন। আমি না পারলে আমার সঙ্গী-সাথীরা রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই পারবে।

লুসি হেসে বললো–আমি বড় হয়েছি তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না। মনে করো কোনো পরিশ্রমের কাজ করতে আমার কষ্ট হবে। কিন্তু বাবা, আজকাল কোনো রকম কঠিন কাজ বা পরিশ্রমের কাজ করতে আমার এতটুকু অসুবিধা হয় না।

পাগলী মেয়ে, আমি তার জন্য চিন্তা করছি না, ভাবছি ওরা তো আছে আমার সাহায্যকারী হিসেবে। তুমি চুপচাপ দেখো।

আচ্ছা বাবা, আমি রাজি কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। ঐ বাক্সের মধ্যে যা থাকবে তা কিন্তু আমার। বলল আমার শর্তে তুমি রাজি?

আচ্ছা, ঠিক আছে মা। বললেন ক্যাপ্টেন হুই। তারপর আবার ঘাড় ফিরিয়ে বললেন তিনি–যদি কোনো মন্দ জিনিস থাকে তাও কি তুমি নেবে মা?

নেবার মত যা থাকবে তা আমার তবে মন্দ কি হতে পারে তা জানি না।

ততক্ষণে বাক্সটা প্রায় মুক্ত হয়ে এসেছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের হাত দু'খানা কাজ করছিলো। তাকে সহযোগিতা করছিলো তার সঙ্গীরা।

বাক্সটার শিকল খুলে গেলো।

উল্লাসিতভাবে বলে উঠলো লুসি-বাবা, এবার বাক্সটার ঢাকনা খুলে ফেলো।

নাবিকগণ সবাই তার কথায় সায় দিয়ে বললো–হাঁ এর পর আর বিলম্ব করা যায় না।

এবার ক্যাপ্টেন হুই ও অন্যান্য নাবিক মিলে বাক্সের ঢাকনাটা খুলে ফেললেন।

বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলো সবাই বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে।

আরফিন হই সুদীর্ঘকাল ধরে জাহাজে রয়েছেন। তার অভিজ্ঞতা কম নয় সমুদ্র সম্পর্কে, কিন্তু এমন বিস্ময়কর ঘটনা কোনোদিন দেখেন নি তিনি। রূপকথার কাহিনীও শুনেছেন হুই অনেক কিছু বাস্তবে এমন কিছু দেখবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

জাহাজের সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

বাক্সের মধ্যে দুজন মানুষ। একজন তরুণ এর একটি তরুণী।

জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন হুই হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন ওদের দেহ। জীবিত আছে বলে মনে হলো তার কাছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের নির্দেশক্রমে নাবিকরা তরুণ আর তরুণীর সংজ্ঞাহীন দেহ বের করে আনলো বাটার বাইরে। সবার চোখেমুখে বিস্ময়, তারা অবাক হয়ে গেছে, কারণ কেউ ভাবতেও পারেনি বাক্সটার ভেতরে জীবন্ত কোনো মানুষ থাকতে পারে।

নাবিকগণকে লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন হুই বললেন–তোমরা মোটেই বিল করো না। এদের বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার দরকার, হয়তো বাঁচতেও পারে!

এতক্ষণ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে মিস লুসি দেখছিলো, যা সে কখনও কল্পনাও করেনি। দুটি জীবন্ত মানুষ একটি ভাসমান বাক্সের মধ্যে। আশ্চর্য বটে, বললো মিস লুসি।

ক্যাপ্টেন আরফিন দুই কন্যার কথায় চোখ দুটো তুলে ধরলেন তার মুখের দিকে, বললেন–হাঁ, বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে! যতক্ষণ গুদের জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো কি করে ওরা এই ভাসমান বাক্সটির মধ্যে তা জানতে।

মিস লুসি বললো– বাবা, তোমার মত আমারও খুব জানার ইচ্ছা। শুধু আমি আর তুমি নই, আমাদের জাহাজে যারা আছে সবার মনেই ভীষণ একটা উন্মাদনা এদের নিয়ে এরা কারা এবং এলো কি করে ঐ বাক্সটার মধ্যে?

লুসি, তুমি যাও, এদের জন্য ক্যাবিন ঠিক করো। গরম দুধ তৈরি রাখো। জ্ঞান ফিরলেই ওদের দুধ খেতে দিও।

আচ্ছা বাবা, আমি যাচ্ছি। মিস লুসির মধ্যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ওদের বাঁচিয়ে তোলার।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই তার সঙ্গীদের নিয়ে তরুণ-তরুণী দুজনকে ক্যাবিনে নিয়ে এলেন। শোয়ানো হলো পাশাপাশি দুটি শয্যায়। জাহাজে ডাক্তার ছিলেন, ক্যাপ্টেন হুইয়ের নির্দেশে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে আসবে।

ডাক্তারের কথাই ঠিক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে এলো ওদের।

জ্ঞান ফিরে এলো প্রথমে তরুণীটির, চোখ মেলে তাকালো সে। পাশে ছিলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই, ডাক্তার জীম লর্ড ও লুসি। তরুণী চোখ মেলে তাকিয়েই বিস্মিত কণ্ঠে বললো—তোমরা কারা? আমি এখন কোথায়?

মিস লুসিই জবাব দিলো-আমরা তোমাদের রক্ষাকারী। আর তোমরা এখন আমার বাবার জাহাজে। ইনি আমার বাবা।

বেশি কথা বলা এখন উচিত হবে না লুসি। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে, এ জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লুসি বললো—আর ওর সংজ্ঞা এখনও ফিরলো না কেন বাবা?

তরুণটির কথা বললো লুসি।

ডাক্তার লর্ড জবাব দিলেন–এখুনি ফিরবে বলে আশা করছি।

তরুণী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পাশের শয্যার দিকে, খুশিতে তার ফ্যাকাশে জীর্ণ মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠলো।

তা লক্ষ্য করলেন ডাক্তার লর্ড এবং ক্যাপ্টেন হুই।

পার্টিরা বুঝতে পারলেন তরুণটি নিশ্চয়ই ওর আপনজন হবে। তাই তরুণীর চোখ দুটো খুশিতে ভরে উঠলো যখন সে দেখলো তার পাশেই রয়েছে তার সঙ্গীটি এবং জানতে পারলো তার সাথী জীবিত আছে।

মিস লুসিও লক্ষ করেছিলো তরুণীর মুখোভাব, তাই তারও খুব খুশি লাগছিলো। লুসির খুশি হবার কথাও বটে, কারণ এই জাহাজে সে ছাড়া আর একটিও মেয়েমানুষ নেই। একমাত্র সঙ্গী তার বাবা, তিনিও তো পুরুষ মানুষ। লুসি

ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠলেও বাবাকে সে বুঝতে দেয়নি কোনোদিন। বুঝতে না দিলেও ক্যাপ্টেন লুই কন্যার দুঃখটা কোথায় তা বেশ অনুধাবন করতেন, তুই প্রায় সময়ই নিজের কাছে কাছে রাখতেন। নাবিক জীবনের অনেক কাহিনী বলতেন। লুসি যেন সর্বদা হাসিখুশিতে থাকে তাই ছিলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের উদ্দেশ্য।

নাবিকদের জীবন কাহিনী পড়তে খুব ভালবাসতো লুসি এ কারণে বহু বই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আরফিন কন্যাকে। লুসি যখন এসব বই পড়তো তখন সে হারিয়ে যেতে আত্নবিস্মৃতির অতলে। সঙ্গীসাথী নাইবা রইলো, তবু তার সঙ্গী আছে রাশিকৃত বই।

বই আর সমুদ্র নিয়ে কাটলেও লুসি মাঝে মাঝে বেশ হাঁপিয়ে উঠতো। তখন সমুদ্রের উচ্ছল ঢেউগুলোর মতই চঞ্চল হয়ে উঠতে লুসি। আজ লুসি বাক্সবন্দী তরুণীকে পেয়ে খুব আনন্দ বোধ করছে। ওকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তার খুব ভাল লাগবে, দিনগুলো কাটবে আনন্দের মধ্য দিয়ে।

লুসি ঝুঁকে পড়লো, তরুণীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—ও বুঝি তোমার স্বামী?

তরুণী বললো—না, আমাদের বিয়ে হয়নি।

তাহলে বন্ধু

হাঁ, আমার প্রিয়জন।

লুসির চোখমুখ খুশিতে ভরে ওঠে। বলল লুসি-তুমি কিন্তু বেশ কথা বলতে পারো। সুস্থ হয়ে উঠলে আরও সুন্দর করে কথা বলতে পারবে। বাবা, তুমি ওর বন্ধুর দিকে লক্ষ রেখো, ওর সংজ্ঞা ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছো মা, ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। দাও, দুধের গেলাসটা আমার হাতে দাও। গরম দুধ খেলে হয়তো তাড়াতাড়ি ও সেরে উঠবে। তরুণীকে দেখিয়ে বললেন-তুমি একে দুধ খাওয়াও। তারপর ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে বললেন ক্যাপ্টেন হুই-তুমি কি বলো ডাক্তার, আমি সত্য বলিনি?

ওদের অবস্থা দেখে তাই মনে হয়, ওরা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। এ ছাড়া ভীষণ দুর্বলও বটে। কাজেই গরম দুধ আর ফলের রস ওদের জন্য বড় উপকারী। ডাক্তার কথাগুলো বলে তরুণটার দিকে তাকালেন, তিনি ভাবছেন, এরা কারা, কেমন করেই বা একটি ভাসমান বাক্সের মধ্যে এলো। যতক্ষণ ওদের পরিচয় তারা জানতে না পারছে ততক্ষণ কারও মনে স্বস্তি নেই।

অন্যান্য নাবিক নিজ নিজ কাজে চলে গেছে, কারণ জাহাজখানা এখন সাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। তারা দুদিনের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছে।

ক্যাপ্টেন হুই, ডাক্তার লর্ড ও মিস্ লুসির অক্লান্ত যত্নে পরদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো তরুণ-তরুণী।

*

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই নিজের মেয়ে লুসির মতই মনে করলেন তরুণীটিকে। কারণ ওর বয়স লুসির চেয়ে বেশি হবে না, সমবয়সী হবে ওরা। বড় মিষ্টি ওর চেহারা, হাসিটা আরও সুন্দর। হাসলে দু'পাশে গালে টোল পড়ে। লুসি ওর বাবাকে বলেই বসলো–ওকে কিন্তু আমি বান্ধবী করে নিলাম।

বললেন ক্যাপ্টেন আরফিন-তা তো বটেই। তবে এখনও কিন্তু ওদের সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় হয়নি। ওরা কারা? কিভাবে তাদের এরকম অবস্থা হয়েছিলো, জানতে আগ্রহী আমরা।

লুসি হেসে বললো—সবেমাত্র কালকে ওদের পেলাম। বেশি সময় তো হয়নি। সব জানা যাবে।

হ্যাঁ মা, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবো ওদের দুজনকে কারণ ওদের সম্বন্ধে আমার সবার মনে কৌতূহল আছে। এসো তো মা, আমার পাশে বসো।

তরুণী দাঁড়িয়েছিলো লুসির পাশে।

এবার সে তাকালো ক্যাপ্টেন হুইয়ের দিকে।

লুসি বললো—আমার বাবা বড় ভালমানুষ, তুমি তার কাছে গিয়ে বসতে পারো। তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

তরুণী এবার এগিয়ে গেলো ক্যাপ্টেন হুইয়ের পাশে।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–বসো।

পাশের চেয়ারে বসলো তরুণী।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–মা, তুমি যে অবস্থায় ছিলে তা মোটেই স্বাভাবিক অবস্থা নয়, কাজেই আমি তোমাকে যা প্রশ্ন করবে তার জবাব নিশ্চয় দেবে?

তরুণী মাথা কাৎ করে সম্মতি জানালো।

ক্যাপ্টেন হুই খুশি হলেন, তিনি লুসিকে লক্ষ্য করে বললেন–মা লুসি, ওকে ডেকে আনন। কোথায় সেই তরুণটি?

লুসি বললো–হয়তো ওর নিজের ক্যাবিনে বিশ্রাম করছে। তুমি এর সঙ্গে কথা বলো, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি। বেরিয়ে গেলো লুসি এবং একটু পরই ফিরে এলো, সঙ্গে সেই তরুণটি।

তরুণটিকে এখন অনেকটা সুস্থ-স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন হুই তরুণটির পা হতে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো–ঐ চেয়ারে বসো।

তরুণ কোনো জবাব না দিয়ে বসলো।

লুসি দাঁড়িয়ে রইলো তরুণীর কাঁধে হাত রেখে। মুখখানা তার হাসিখুশিতে ভরা।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন– মা, আমি তোমাকে লুসির মত মনে করছি। তোমার অভিভাবক হিসেবে আমি এখন তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবোর।

কোনো জবাব দিলো না তরুণী, সে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো তরুণটার দিকে।

বললেন ক্যাপ্টেন হুই–প্রথম প্রশ্ন হলো তোমার নাম কি, তোমার সঙ্গীটি কে এবং তোমার আর তার সম্পর্ক কি? এই কথাগুলোর জবাব দিলে আমি বুঝতে পারবো তোমাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে কিনা।

তরুণী বললো—-আমার নাম ফুল্লরা। আমার সঙ্গীটি আমার ছোটবেলার সাথী। ওকে আমি ভালবাসি কারণ ছোটবেলা থেকেই আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি।

বেশ, এবার তোমার পরিচয় বলো? বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

ফুল্লরাই জবাব দিলো আমাদের পরিচয় জানানো সম্ভব নয়।

লুসি বলে উঠলো—কেন? কেন সম্ভব নয়?

সব জানানো যায় না। বললো ফুল্লরা।

ক্যাপ্টেন হুই জোর করে কিছু জানতে চান না। এতে সত্য চাপা পড়তে পারে এবং মিথ্যার জন্ম হতে পারে। তাই তিনি বললেন-বেশ, তোমাদের আপত্তি থাকলে আমি বা লুসি জানতে চাই না। তবে তোমরা ঐ আশ্চর্যজনক বাক্সটার মধ্যে কেমন করে প্রবেশ করলে? এ ছাড়া তোমার সঙ্গীর নাম জানা হয়নি এখনও। অবশ্যই এর নামটা জানাতে কোনো বাধা বা আপত্তি নেই–কি বলো?

বললো ফুল্লরা–হাঁ, ওর নাম জাভেদ……

লুসি অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো জাভেদ! নামটা বড় অদ্ভুত। তাকালো লুসি জাভেদের দিকে। ক্যাপ্টেন হুইও তাকিয়ে ছিলেন জাভেদের দিকে।

জাভেদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলো, ক্যাপ্টেন হই আর লুসির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে বিব্রত করে তুললো। জন্মাবার পর থেকে জাভেদ যে পরিবেশে বড় হয়েছে তা মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না, গভীর জঙ্গল আর হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। লোকালয় বা স্বাভাবিক মানুষের সংস্পর্শে সে তেমন করে কোনোদিন আসেনি। ক্যাপ্টেন হুই আর লুসির দৃষ্টি যেন তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছিলো। ওরা বার বার আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছে, ভাবছিলো জাভেদ। এবার সে বলেই বসলো–ফুল্লরা, তুমি কথা বলতে থাকো, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। বেরিয়ে গেলো জাভেদ কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করে।

ফুল্লরা বললো–ও বড় খেয়ালী।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই অবাক হয়ে শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে লক্ষ করছিলেন জাভেদ আর ফুল্লরাকে। ফুল্লরার কথাগুলো বেশ ভাল লাগছিলো তার কাছে। একটা আশ্চর্যজনক কাহিনীর মত মনে হচ্ছিলো। বললেন ক্যাপ্টেন হুই–যেতে দাও ওকে। বাইরের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র আর আকাশ দেখবে। এবার বলো কেমন করে বাক্স অথবা ঐ জলযানটার মধ্যে তোমরা এলে?

ফুল্লরা ক্ষণিকের জন্য কিছু অন্যমনস্ক হলো বলে মনে হলো। হয়তো বা ভাবছে অনেক কিছু। হয়তো বা স্মরণ করার চেষ্টা করছে বাক্সটার মধ্যে তারা কেমনভাবে এলো! এটা তার কাছেও কিছুটা বিস্ময়কর লাগছে। একটা উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠলে ফুল্লরার মুখমন্ডলে।

লুসি বলেই বসলো–সত্যি বলতে কি ফুল্লরা, তোমাদের এই বিস্ময়কর কাহিনী শোনবার জন্য আমিও বাবার মত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। যতক্ষণ তুমি সব ঘটনা না বলবে ততক্ষণ আমরা একচুল নড়বো না। জাহাজের ঝকঝক শব্দটা এখনও আমার কাছে খুব তীব্র মনে হচ্ছে। কান ঝালাপালা করছে আমার। এখন যদি শব্দটা থেমে যেতো তা হলে নিশ্চিন্ত মনে আরামে তোমার কথাগুলো শুনতাম। বাবা, শব্দটা আমার কাছে যেমন খারাপ লাগছে তেমনি কি তোমার কাছেও মনে হচ্ছে?

হাঁ মা, আজ ইঞ্জিনের শব্দটা যেন বেশি বেড়ে গেছে! যাক তবুও আমরা সব শুনতে পাবো। তুমি বলো ফুল্লরা?

লুসি জাভেদের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়লো। ও যেন এখন কতকটা শান্ত।

ক্যাপ্টেন হুই নতুন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট থেকে একমুখ ধোয়া ছুঁড়ে দিলেন সম্মুখ দিকে। এ মুহূর্তে তার চোখেমুখে জানার বিপুল বাসনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ফুল্লরা বললো—আমি আর জাভেদ একদিন আমাদের নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে রওয়ানা দিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য শত্রুকে খুঁজে বের করা। গহন বন, চারদিকে

নিস্তব্ধতা, শুধু হিংস্র জীবজন্তুর আনাগোনার শব্দ। জাভেদ আমার পাশে রয়েছে তাই ভয় হচ্ছিলো না আমার, অবশ্য আমি নিজেও সাহসী কম নই।

লুসি বললো—সেটা কোন বন ছিলো?

সঠিক বলতে পারছি না, কারণ আমরা শত্রুর সন্ধানে অশ্ব ছুটিয়ে বহুদূরে চলে এসেছিলাম। আমার অশ্বটি জাভেদের অশ্বের মত তত গতিবার ছিলো না, অনেকটা দুর্বল ছিলো এ কারণে মাঝে মাঝে আমাদের পথে বিশ্রাম নিতে হয়েছিলো। গহন বন, আমরা চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সন্ধান চালাচ্ছি। জাভেদ এবং আমার হাতে ছিলো বিষাক্ত তীর-ধনু। দুর্জয় সাহস নিয়ে আমরা গভীর বনের মধ্যভাগে এসে পড়েছি। এত ঘন বন যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত বনে প্রবেশ করতে পারে না। মাঝে মাঝে মন আমার ফিরবার জন্য ব্যাকুল হলেও কিছু বলতে পারছিলাম না, কারণ আমি জানতাম জাভেদ ফিরবার নয়। আমরা নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘন বনের অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি শক্ত জাল এসে আমাকে অশ্বসহ জড়িয়ে ফেললো। আমি ফিরে তাকালাম আমার সঙ্গী জাভেদের দিকে। তার অবস্থাও আমার মত। জাভেদের কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা ছিলো, জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে বসে ছোরাটা খুলে নিয়ে জালখানাকে কেটে ফেলার চেষ্টা করছে। তাকে তখন হিংস্র বাঘের মত মনে হচ্ছিলো। আমার কোমরের বেল্টেও ছোরা ছিলো, আমি নিজেও সেই ছোরা খুলে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাত দুখানা শিথিল হয়ে এলো। আমার নাকে একটি সুমিষ্ট গন্ধ প্রবেশ করলো তখন আমি চিৎকার করে জাভেদকে ডাকলাম কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে ঝাপসা হয়ে আসছিলো। কিছুটা খেয়াল আছে, লক্ষ করলাম অশ্বপৃষ্ঠে জাভেদ ঢলে পড়েছে। তারপর আর কিছু আমার স্মরণ নেই। একটু থেমে বললো ফুল্লরা নিশ্চয়ই শত্রু আমাদের অনুসরণ করছিলো এবং তারা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো আমাদের আটক করতে।

লুসি আর ক্যাপ্টেন আরফিন শুই স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলেন। লুসি বলে উঠলো—- সংজ্ঞা ফিরলে নিজেদের কি অবস্থায় দেখলে তোমরা? লুসির চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠলো।

কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হলো ফুল্লরা, দৃষ্টি ক্যাবিনের দরজা দিয়ে চলে গেলো সীমাহীন আকাশের দিকে। বললো সে– জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেলে তাকালাম। শুধু জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না। ভাল করে চোখ রগড়ে তাকালামনা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু আমার দেহটা দুলছে। আর

তার সঙ্গে কানে ভেসে আসছে ভীষণ একটা শব্দ, জলকল্লোলের শব্দ বলে আমার মনে হলো। পাশেই যেন কোনো চাকা ঘুরছে এবং চাকাটা গভীর জলরাশিকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

তারপর! বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো লুসি।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন-মনোযোগ দিয়ে শোনো মা লুসি। সব বুঝতে পারবে আপনা আপনি।

লুসি একটু হাসবার চেষ্টা করলো। হয়তো বা বাবার কথাটায় সে লজ্জা পেয়েছে। একটু নড়ে বসলো সে।

ফুল্লরা বলে চলেছে—আমার মনে পড়লো সব কথা। তবে কি জাভেদকে ওরা হত্যা করেছে! হঠাৎ আমার হাত খানা কারো শরীর স্পর্শ করলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম জাভেদ আমার পাশে রয়েছে এবং এখনও তার সংজ্ঞা ফিরে আসেনি। আমি উঠে বসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার এবং জাভেদের হাত একসঙ্গে বাঁধা আছে শক্ত রশি অথবা শিকল দিয়ে। শুয়েই শুয়েই ভাবতে লাগলাম আমরা কোথায় আর কি অবস্থায় আছি। জলকল্লোলের ভীষণ শব্দ। সঙ্গে রয়েছে একটা একটা যান্ত্রিক আওয়াজ। আমরা যে বস্তুটির মধ্যে শায়িত আছি সেটা একটা বাক্স অথবা ভাসমান জলযান ছাড়া কিছু নয় এটা আমি আন্দাজ করে নিলাম। জাভেদ আমার পাশে কিনা সন্দেহ জাগছিলো মনে, কারণ অন্ধকারে তাকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না। জলকল্লোল আর যান্ত্রিক শব্দ শুনতে শুনতে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। কারণ ক্ষুধা-পিপাসায় পেটটা আমার জ্বালা করছিলো। জানি না কত সময় হলো আমরা এ অবস্থায় আছি। কাজেই দু'চোখ ভরে আমার ঘুম আসছিলো। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় জাভেদ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে শব্দ করলো। আমার তন্দ্রা ছুটে গেলো, বললাম জাভেদ, আমি বেঁচে আছি এবং তোমার পাশে আছি...জাভেদ কোনো জবাব দিলো না। হয়তো ওর কানে আমার কণ্ঠস্বর পৌঁছালো না, কারণ এত জোরে শব্দ হচ্ছিলো যে কানে তালা লাগার জোগাড় আর কি!

ক্যাপ্টেন হুই বলে উঠলেন-কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো মা?

বললো ফুল্লরা–না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কারণ এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। বরং কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছি। এখন তোমরা ছাড়া আর কেই বা আছে

আমাদের।

লুসি সরে এলো চেয়ারখানা নিয়ে ফুল্লরার কাছে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো—তুমি কিছু ভেবো না। আমার বাবা বড় ভাল মানুষ তোমাকে পূর্বেই বলেছি। সব বলতে পারো কোনো দ্বিধা না করে।

ফুল্লরা বললো—আমাদের কানে শব্দটা ক্রমান্বয়ে সয়ে এলো তখন আমরা উভয়ে উভয়ের কথা শুনতে পারলাম। জাভেদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সেও কিছু জানে না এখন আমরা কোথায় কি অবস্থায় আছি। তবে আন্দাজ করে নিলাম আমরা কোনো জলযান বা ঐ ধরনের কোনো বস্তু মধ্যে বন্দী আছি এবং গভীর সাগরতলে রয়েছি। শব্দটা কিসের তা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। রাত না দিন তাও বুঝতে পারলাম না আমরা। ক্ষুধা পিপাসা তীব্র হয়ে উঠলো। জাভেদ হাত দুখানা মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। ওর অসাধারণ শক্তির জোরে আমাদের হাতের বন্ধন মুক্ত হলো। তারপর একদিন আমরা সেই ভীষণ শব্দ আর শুনতে পেলাম না। আমাদের বাহনটা যেন এলোপাতাড়ি ছুটছে। আমরা ঐ বাহনটার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, ক্ষুধার জ্বালা আমাদের পেটের নাড়ীভুড়ি হজম হবার যোগাড়। আমার খোঁপার মধ্যে সব সময় একটি ছোট ছোরা লুকানো থাকতো। ঐ ছোরাখানা সেই মুহূর্তে কাজে লাগলো। জাভেদ ছোরাখানা দিয়ে সেই জলযানটার উপরিভাগে ফুটো করার অবিরাম চেষ্টা চালালো। ক্ষুধা-পিপাসায় আমার চেয়ে ওর কম কষ্ট হচ্ছিলো না তবুও সে এতটুকু বিচলিত হলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো জাভেদ। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো সে। তার চেয়েও আমার অবস্থা বেশি কাহিল হয়ে পড়লো। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম, আর কিছুই আমার স্মরণ নেই।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–তোমার সঙ্গে জাভেদও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো আমার মনে হয়। কারণ সেই ভাসমান জলযান বা বাক্সটার মধ্যে তাকেও আমরা সংজ্ঞাহারা অবস্থায়। পেয়েছি।

লুসি বললো–হা বাবা, আমরা ওদের দুজনকে একই অবস্থায় ঐ বাক্সটার মধ্যে দেখেছি। সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তার দয়ায় এতো কষ্টের পরও ওরা জীবনে বেঁচে আছে। কি যে আনন্দ লাগছে আমার তোমাকে কি বলবো বাবা!

হাঁ মা, তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে ফুল্লরা সাথী হলো। মাঝে মাঝে তোমরা আমার কাছে বসো, আমি তোমাদের অনেক কাহিনী শোনাবো।

সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ মা হা শোনাবো, কিন্তু ফুল্লরা তার আর জাভেদের যে কাহিনী আজ শোনালো তার চেয়ে বিস্ময়কর কাহিনী বুঝি আর কিছু হয় না। যাও লুসি, বেচারা জাভেদ বুঝি একা একা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যাও ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলোগে। মা ফুল্লরা, তোমার কাহিনী কিন্তু শেষ হয়নি, আরও জানা দরকার রয়েছে আমার।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিলো না।

লুসি বললো—সব কথা একদিনে শেষ হয় না বাবা। আমরা অপেক্ষা করবো জাভেদ আর ফুল্লরার কাহিনীর রহস্য কি তা জানতে। চলো ফুল্লরা, জাভেদ হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছে।

ফুল্লরা বললো–না, ওর স্বভাব তোমরা জানো না, ও এক অদ্ভুত মানুষ।

লুসি আর ফুল্লরা এসে পড়লো ডেকে।

কিন্তু সেখানে তারা কাউকে দেখতে পেলো না।

তবে জাভেদ কোথায়!

লুসি তাকালো ফুল্লরার মুখের দিকে।

বেশ চিন্তাযুক্ত মনে হলো ফুরাকে। তার ব্যাকুল চোখ দুটো জাহাজের ডেকে চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করছে।

লুসি বললো—-ভাববার কিছু নেই, কারণ জাহাজখানা এখন সাগরবক্ষে চলমান অবস্থায় আছে।

ফুল্লরার কানে লুসির কথাগুলো প্রবেশ করলো কিনা বোঝা গেলো না। সে উত্তেজিতভাবে ডাকতে শুরু করলো-জাভেদ……জাভেদ……জাভেদ,

হঠাৎ একজন খালাসী ছুটে এসে বললো–ম্যাডাম, ঐ দেখুন সে পালিয়েছে……..আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো গভীর সমুদ্রের দিকে।

লুসি আর ফুল্লরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলো জাভেদ সাগরের বুকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুল্লরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

লুসি যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কি বলবে সে ফুল্লরাকে ভেবে পেলো না। ফুল্লরার কাঁধে হাত রাখলো সে।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উত্তেজিতভাবে বললেন-জাভেদ নাকি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েছে।

লুসিই জবাব দিলো ঐ দেখো বাবা, জাভেদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললো—ঐ যে যাচ্ছে-উঃ কি ভীষণ লোক……

ক্যাপ্টেন হুই চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাকালেন, তার মুখমন্ডল ফ্যাকাশে লাগছিলো। একবার তাকালেন তিনি বাইনোকুলার সরিয়ে ফুল্লরার দিকে। সত্যি তার চেহারা তখন বড় করুণ লাগছিলো।

ক্যাপ্টেন হুই বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না, তিনি সারেঙ্গকে জাহাজ থামিয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন এবং লাইফবয় সহ স্পীডবোট নামাতে বললেন।

ক্যাপ্টেনের আদেশমত জাহাজ থামানো হলো। স্পীডবোট নিয়ে দু'জন নাবিক ঐদিকে এগুলো, যেদিকে জাভেদকে সাঁতার কাটতে দেখা গিয়েছিলো।

কিন্তু ব্যর্থ হলো ওরা।

স্পীডবোট নিয়ে অনেক সন্ধান চালিয়েও জাভেদকে পাওয়া গেলো না। ভীষণ একটা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো ফুল্লরা। যখন ওরা ফিরে এলো হতাশা আর বিফলতায় মুখ কালো করে, তখন ফুল্লারা চিৎকার করে কেঁদে উঠে ডেকের উপর বসে পড়লো। তার চোখের সম্মুখে গোটা পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে এলো।

ক্যাপ্টেন হুই রুমালে চোখ মুছলেন।

লুসি ফুল্লরার কাঁধে হাত রাখলো, ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

*

দুর্ধর্ষ জাভেদের বলিষ্ঠ বাহু দুটি ক্রমে শিথিল হয়ে এলো। জাহাজখানা দূরে বহুদূরে সরে গেছে। বন্দী জীবন জাভেদের একেবারে অসহ্য, ফুল্লরার কথা মুহূর্তের জন্য একবার মনে পড়েছিলো তবুও জাভেদ সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, কারণ সে ঐ জাহাজে আটকা পড়তে চায় না।

কখনও সাঁতার কেটে, কখনও পানিতে দেহটা ভাসিয়ে দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ একটি তক্তা জাতীয় বস্তু তার হাতের নিচে পড়ায় সেটাকে সে খুব শক্ত করে ধরে ফেললো।

তক্তাখন্ডটা যেন তার রক্ষাকারী হিসেবেই এগিয়ে এসেছিলো তার পাশে। জাভেদ তক্তার উপর নিজের দেহ এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, তক্তাটা তাকে বহন করে নিয়ে চললো অজানার পথে।

কিন্তু প্রতিমুহূর্তে জাভেদ কোনো ভয়ংকর জলজীবের আক্রমণের আশঙ্কা করছে। সে জানে সমুদ্রের গভীর অতলে বিচরণ করে ফিরছে নানা হিংস্র প্রাণী। যে কোনো সময় তার দেহটা গ্রাস করে ফেলতে পারে।

দিনের সূর্য অস্তমিত হলো।

জমাট অন্ধকারে ঢেকে গেলো সমস্ত পৃথিবী। আকাশ আর সমুদ্র সব একাকার হয়ে গেলো। শুধু তক্তাটাকে আঁকড়ে ধরে ভেসে চলেছে জাভেদ।

চারদিকে থৈ থৈ অন্ধকার আর সমুদ্রের গর্জন।

ঢেউগুলো কখনও তক্তাসহ জাভেদকে তলিয়ে দিচ্ছে আবার কখনও ভাসিয়ে তুলছে ঢেউয়ের মাথায়। আকাশে অগণিত তারার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তারাগুলোর দিকে তাকাবার সময় নেই ওরা। তবু চোখে ধরা পড়ে, তারাগুলো তাকে দেখে যেন বিদ্রুপের হাসি হাসছে। কেন তুমি জাহাজ থেকে সাগরে লাফিয়ে পড়লে। জাহাজের মানুষগুলো তো তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেনি। ওরা তোমাদের দুজনকে বাক্সবন্দী থেকে উদ্ধার করেছে। ওরা চেয়েছিলো তোমাদের নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে কিন্তু সে সময়টুকু তুমি দিলে না। এবার বোঝে মজাটা সাগরের বুকে ঠান্ডা পানিতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এ কষ্টই তোমার প্রাপ্য ছিলো।

জাভেদের বয়েই গেলো।

তারাগুলো বিদ্রুপের হাসি হাসলে তাতে জাভেদের কিছু যায় আসে না। সে একান্ত একা, নিজকে সে সম্পূর্ণ একজন মনে করে। কারও কথা নিয়ে ভাববার সময় তার নেই। প্রচন্ড শক্তির উৎস জাভেদ। তার সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি সবাইকে মুগ্ধ করলেও সে কিছুতেই মুগ্ধ বা অভিভূত হয় না। পৃথিবীর অপরূপ রূপ তার কাছে ধরা পড়ে না। জাভেদ যেন অন্য এক জগতের মানুষ!

ভোর হয়।

সাগরের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত হয়ে এসেছে।

সোনালী সূর্যের আলো সাগরের অথৈ পানিকে রক্তরাঙা করে তোলে। মেঘমুক্ত আকাশ।

ছোট ছোট ঢেউগুলোতে দোল খাচ্ছে জাভেদসহ তক্তাখানা! পূর্বের মত দ্রুতগতিতে এখন আর এগুচ্ছে না সেটা। কেমন যেন ধীরমন্থর হয়ে এসেছে তক্তাটার গতি।

সাগরটা আজ যেন বড় শান্ত।

প্রচন্ড ঢেউগুলো এখন ঝিমিয়ে এসেছে।

একটা অশান্ত বাতাস সা সা করে বয়ে যাচ্ছে জাভেদের মাথার উপর দিয়ে, তবে বেশ হাল্কা ছিলো বাতাসটা।

হঠাৎ জাভেদের নজরে পড়লো আকাশে দিকে। এক ঝাক শুভ্র বলাকা ডানা মেলে উড়ে যাছে আকাশ দিয়ে। জাভেদ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সে জানে মধ্য সাগরে কোনো সময় উড়ন্ত প্রাণীকে উড়তে দেখা যাবে না। তবে নিশ্চয়ই তার তক্তাখানা তাকে সাগরতীরে এনে ফেলেছে। তীরের সন্নিকটে এসে পড়েছে সে।

ভাল করে তাকালো জাভেদ।

সত্যি সে দেখতে পেলো দূরে, বেশ কিছু দূরে কালো রেখার মত মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই তীরের অদূরে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম হবে। এবার জাভেদ দ্রুত সাঁতার কাটতে

শুরু করলো। যদিও সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো তবুও সে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়। সঁতারে জাভেদ অতিশয় দক্ষ।

একেবারে তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো জাভেদ।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিরাট বড় আকার কচ্ছপ তার সামনে ভেসে উঠলো।

জাভেদ একটু ঘাবড়ে গেলেও একেবারে ভড়কে গেলো না। কচ্ছপটাকে সে এড়িয়ে সম্মুখে আঁতার কেটে এগুলো।

কচ্ছপটা জাভেদকে দেখতে পেয়ে তাড়া করলো না বা আক্রমণ চালালো না। জাভেদ খুশি হলো, দয়াময় তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন এই মহা বিপদ থেকে। অবশ্য বিপদকে গ্রাহ্য করে না জাভেদ। করলে সে সাগরের বুকে লাফিয়ে পড়তে পারতো না। শুধু আজ নয়, এমনি বহু বিপদের মুখে জাভেদ স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জাভেদ সাগরবক্ষ হতে এক সময় উঠে এলো তীরে। দীর্ঘ সময় ধরে সাগরের নোনা জলে থেকে তার দেহটা যেন রক্ত শূন্য হয়ে পড়েছিলো। ফ্যাকাশে লাগছিলো তাকে। সূর্যের তাপ তার দেহে আরামদায়ক মনে হতে লাগলো।

জাভেদ বালির উপর দেহটা এলিয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে তীরে পড়ে রইলো সে, তারপর উঠে দাঁড়ালো। একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলা–তার বাহন তক্তাখানা কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। না জানি কতদূর চলে গেছে কোন অজানার পথে।

জাভেদ হাঁটতে শুরু করলো।

জঙ্গলটা ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে।

অত্যন্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা বোধ করছে জাভেদ। তার শরীরে কোনো জামা ছিলো না। শুধু একটি আঁটসাট প্যান্ট তার পরনে ছিলো। প্যান্টের পকেটে ছিলো ফুল্লরার খোঁপার সেই ক্ষুদ্র সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা।

জাভেদ পা চালিয়ে চললো।

জঙ্গলের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, ঠিক এ মুহূর্তে তার কানে ভেসে এলো একটি আর্তকণ্ঠস্বর।

জনপ্রাণীহীন এই সমুদ্রতীরে মানুষ এলো কোথা হতে। জাভেদ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, তারপর ছুটে চললো সেই দিকে যেদিক হতে আর্তনাদের শব্দটা ভেসে এসেছে।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের পাশে ভীষণ ধস্বাধস্তি চলছে বলে জাভেদের মনে হলো। তাড়াতাড়ি ঐ ছোট্ট ছুরিখানা বের করে নিলো সে হাতের মুঠোয় তারপর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। এবার জাভেদ দেখতে পেলো একটি জংলী যুবককে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরেছে বিরাট একটি অজগর।

জংলী যুবকটির গায়ের রং মিশকালো তেমনি জমকালো অজগরটি। জাভেদ জংগলে বড় গয়েছে, অনেক অজগর সাপ সে দেখেছে কিন্তু এত বড় অজগর কোথাও দেখেনি।

অজগরটির দেহের কিছু অংশ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জড়ানো আর সম্মুখভাগ দিয়ে জংলী যুবকটির দেহ বেষ্টন করে ধরেছে।

যুবকটিও কম শক্তিশালী নয়।

তুমুল লড়াই চলছে জংলী যুবক আর অজগরে।

সর্পরাজ যুবকটির দেহ মুখ গহ্বরে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আর যুবকটি সর্পরাজের কবল থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

জংলী যুবকটি সর্পরাজের বেষ্টনী থেকেই দেখতে পেলো জাভেদকে। যদিও সে অবাক হলো কিন্তু ভাববার সময় তার নেই। যুবক জাভেদকে লক্ষ্য করে অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো, রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

জাভেদ তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না। তবুও জাভেদ জংলী যুবকটিকে সর্পরাজের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো। ছোট ছোরাখানা দক্ষিণ হাতে নিয়ে গাছের যে অংশ সর্পরাজ বেষ্টন করে রেখেছিলো জাভেদ সে অংশে এসে দাঁড়ালো এবং ছোরাখানা দিয়ে সর্পরাজের পেটের কিছু অংশ চিরে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে সর্পরাজ তার সম্মুখভাগের অংশটা শিথিল করে ফেললো এবং অজগরের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে গেলো জংলী যুবকটির দেহ।

জংলী যুবক দু'হাত দিয়ে সর্পরাজের দেহটা সরিয়ে ফেললো এবং বেরিয়ে এলো সর্পরাজের বেষ্টনী থেকে।

বিরাট অজগর তখন মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

সর্পরাজের ঠিক নাভির নিচে চিরে ফেলে ছিলো জাভেদ তাই, তাজা রক্তের সঙ্গে কিছুটা নাড়ীভুড়িও বেরিয়ে এসেছিলো। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সর্পরাজ। জংলী যুবকটা কিছু সময় ভুলুণ্ঠিত সর্পরাজের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর তাকালো সে জাভেদের দিকে। জাভেদকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে যুবকটি, তবুও তার চোখেমুখে একটা আনন্দদীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। সর্পরাজের কবল থেকে তার কোনো মতেই উদ্ধার ছিলো না, যদি ঐ তরুণটি সর্পরাজের পেটের মধ্যে ছুরি প্রবেশ করিয়ে তাকে হত্যা না করতো। নইলে এতক্ষণ যুবকটির দেহ সরাজের পেটে চলে যেতো।

জংলী যুবক হঠাৎ ছুটে এসে জাভেদকে জড়িয়ে ধরলো তারপর অদ্ভুত শব্দ করে চিৎকার করতে লাগলো।

নির্জন বনভূমি সে চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

এবার জাভেদের হাত ধরে যুবক টেনে নিয়ে চললো গহন জঙ্গলের দিকে। জাভেদ বাধা দিলো না। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর একটি বৃহৎ পর্বতাকার উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

জংলী যুবকটি মুখে হাত দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে শব্দ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জংলী নারী-পুরুষ এসে দাঁড়ালো তাদের চারপাশে, সবার হাতেই তীক্ষ্ণ বর্শা। সমস্ত দেহে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত চিহ্ন দ্বারা অংকন-রেখা চিত্রিত করা হয়েছে। কারও নাকের দু'পাশে কেটে দু'পাক করে লৌহবলয় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীরের নানা স্থানে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতচিহ্নের শুষ্ক দাগ।

বুকে-পিঠে এমন কি মুখমন্ডলেও নানা ক্ষতচিহ্ন ভীষণ চেহারার জংলীদের আরও ভীষণ আর ভয়ংকর করে তুলেছে।

নারী পুরুষ সবাই উলঙ্গপ্রায়।

গাছের ছাল বা পশুর চামড়ার সামান্য একটু খন্ড দিয়ে লজ্জা স্থান ঢাকা রয়েছে। নারীদের মাথায় চুল নেই, নেড়া মাথা বলা চলে। তার মধ্যে লম্বা লম্বা করে কাটা ক্ষতচিহ্ন শুকিয়ে ফিতার মত দেখাচ্ছে। কারও কারও ঠোঁট কাটা এবং দু'ভাগ করা। নারীদেরও পরনে একই ধরনের ছাল বা বস্ত্রখন্ড, বুকে কোনো আবরণ নেই।

জাভেদকে দেখেই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো সবাই।

জংলী যুবক অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো। কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে সে। একজন বৃদ্ধ জংলী, ভয়ংকর তার চেহারা–সে জঙলী যুবকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং তাকালো জাভেদের দিকে। জাভেদ বুঝতে পারলো ঐ বৃদ্ধ জংলীটা জংলীদের সর্দার।

যুবকটি তখনও কিছু বলছিলো। হাত-মুখ নেড়ে বলছিলো সে এবং মাঝে মাঝে দেখাচ্ছিলো জাভেদকে।

ওর কথাগুলো বিস্ময় সহকারে শুনে যাচ্ছিলো জংলীরা। তারা নিজ নিজ হাতের বর্শা নামিয়ে নিয়েছিলো জাভেদের দিক থেকে। জঙলী যুবকের কথায় ওরা তাকাচ্ছিলো জাভেদের দিকে, তাদের চোখমুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওরা জংলী যুবকের কথায় জাভেদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

জাভেদ আশ্বস্ত হলো।

ওরা তাকে হত্যা করবে না বলে মনে হচ্ছে। যুবকটি ওদের সর্দারের সন্তান, কারণ সকলেই তারা যুবকটিকে আদর সোহাগ করছে।

এবার জাভেদকে নিয়ে ওরা একটা উঁচু স্থানে দাঁড় করালো।

যুবকটিও তার পাশে দাঁড়ালো।

মাঝে দাঁড়ালো সেই বলিষ্ঠ ভয়ংকর চেহারার বৃদ্ধটি।

যেমন জমকালো রং জংলী সর্দারের এবং তার দলবলের তেমনি জমকালো তার সন্তান যুবকটির রং। আর জাভেদ ছিলো উজ্জ্বল ফর্সা, তার সুঠাম দীপ্তিময় চেহারা অদ্ভুত সুন্দর ছিলো।

এদের মধ্যে জাভেদকে বড় বেমানান লাগছিলো।

জংলী সর্দার জাভেদ আর জংলী যুবকটির হাত ধরে উঁচু করে তুললো, তারপর কি সব বললো তাদের ভাষায় যার একবর্ণও বুঝতে পারলো না জাভেদ। তবে এটুকু বুঝলে ওরা তাকে অত্যন্ত প্রীতি সহকারে গ্রহণ করেছে। যদিও তাকে প্রথমে তারা শত্রু মনে করেছিলো।

সেদিন থেকে জাভেদ ওদের পরম বন্ধু হলো।

যদিও ওদের কথাবার্তা জাভেদ বুঝতে পারে না তবুও বোঝার চেষ্টা করছে।

জংলী যুবকটি আর জাভেদের বয়স প্রায় সমানই হবে।

উভয়ে উভয়কে ভালবাসলো ওরা।

জাভেদ ওকে জিং বলে ডাকতো।

আসলে জংলী যুবকটির নাম ছিলো জিঙ্গারু। এ নামেই তাকে সে ডাকতে শুনেছে ওর দলবলের মুখে। জাভেদও তাই জিং নামটি পছন্দ করে। কথা না বুঝলেও একসঙ্গে চলাফেরা করে ওরা দুজনে।

জাভেদ যেন একটা আশ্রয় পেলো এই অজানা অচেনা জায়গায়। ওদের সঙ্গে মিশে সে। জঙ্গলে শিকার করে। কাঁচা মাংস খায় ওরা। জাভেদও তাই খায়, তবে বেশি খায় সে বনজঙ্গলের সুস্বাদু ফল।

হরিণের মাংস জাভেদের প্রিয় খাদ্য।

জংলীরা সব রকম জীবজন্তুর মাংস খায়। জংলীদের আচরণ খুব নৃশংস। দয়ামায়া বলতে ওদের কিছু নেই। ওরা যে কোনো কারণে যাকে যখন খুশি হত্যা করে। প্রায়ই তরুণ তরুণীদের দেহে অস্ত্র দ্বারা ক্ষতচিহ্ন করে দেওয়া হয়। সে দৃশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তবু ওরা তা করে।

জাভেদকে ওরা সমীহ করে, জাভেদ ওদের মধ্যে মিশে থাকতে চায়।

মাঝে মাঝে জাভেদ সমুদ্রতীরে এসে বসে।

হয়তো বা মনে পড়ে ফুল্লরার কথা, তবে তা ক্ষণিকের জন্য।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। এমনি কেটে যায় বেশ কিছু দিন। জাভেদ কাঁচা মাংস আর জঙ্গলের কাঁচা ফল খেয়ে খেয়ে আরও শক্তিশালী আর ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সে ভুলে গেলো অতীত জীবনের কথা। জাভেদ এখন জংলীদের নিয়ে বসবাস করে, তাদের আচরণ এবং কথাবার্তা সে শিখে নিলো। পরনের প্যান্টখানা ছিঁড়ে গেলো স্থানে স্থানে।

জাভেদের কোনোদিকে খেয়াল নেই। শুধু বনজঙ্গল আর জীবজন্তু নিয়ে তার সময় কাটে। সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে মাছ ধরে জিঙ্গারুর সঙ্গে।

জাভেদ কাঁচা মাছ খেতে পারে না।

একদিন জিং-এর সঙ্গে কাঁচা মাছ খেয়েছিলো, খাওয়ার পর তার ভীষণ বমি হয়, এরপর থেকে জাভেদ আর কাঁচা মাছ খায় না। মাছ ধরতে জাভেদ ওস্তাদ কিন্তু সে খেতে ভালবাসে না। অনেক মাছ সে ধরে আনতে, জংলীরা আনন্দ সহকারে খেতে।

মাঝে মাঝে জাভেদ সমুদ্রে সাঁতার কাটতো।

একদিন এক কুমিরের সঙ্গে লড়াই হলো জাভেদের, ভীষণ লড়াই। জিং তো অবাক, এতো শক্তি রাখে জাভেদ! একটা কুমিরকে সে পরাজিত করলো।

জিং বাড়িতে এসে ভাইকে ঘটনাটা বললো।

সর্দার তো সন্তানের মুখে কথাটা শুনে দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে জাভেদকে আলিঙ্গন করলো।

এ দৃশ্য সহ্য হলো না ছোট সর্দারের।

জিং-এর চাচা ছিলো হোট সর্দার। সে প্রথম থেকেই ঈর্ষা করতে জাভেদকে। সে ভাবতে কে এই সাদা চামড়ার তরুণ যে তাদের সর্দারের প্রিয়পাত্র বনে গেছে।

চাচা দূর থেকে ওর দিকে কটমট করে তাকাতো কিন্তু সর্দারের ভয়ে সে কিছু বলতো না। তাছাড়া তার ভ্রাতুস্পুত্র জিং-এর জীবন রক্ষা করেছিলো জাভেদ সর্পরাজকে হত্যা করে।

চাচার নাম ছিলো ক্যাঙ্গুরুলিং! ভীষণ শয়তান আর হিংস্র জংলীরা সবাই ভয় করতে ক্যাঙ্গুরুলিংকে। যেমন করতে বড় ভাই সর্দার মারুলিংকে।

একদিন জাভেদ একাই গেলো মাছ ধরতে সমুদ্রে।

জিং কোনোদিকে গিয়েছিলো কোনো কাজে।

চাচা ক্যাংজুরুলিং আড়াল থেকে সব লক্ষ করছিলো। কেমন করে এই শত্রুটিকে নিপাত করবে এটাই তার চিন্তা। সে একটি বর্শা হাতে অপর একটি নৌকা নিয়ে জাভেদের নৌকার দিকে অগ্রসর হলো।

জাভেদের নৌকা তখন তীর ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তার লক্ষ্য সমুদ্রের পানির দিকে। প্রচন্ড ঢেউগুলোর মাথায় তার ছোট নৌকাখানা দোল খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জাভেদের হাতেও বর্শা। সে বর্শা উদ্যত রেখেছে, মাছ দেখলেই মারবে খোঁচা।

কিন্তু কখন চাচা ক্যাংজুরুলিং এসে পড়ে তার নৌকার কাছাকাছি টের পায় না জাভেদ। যেমনি ক্যাঙ্গুরুলিং জাভেদকে লক্ষ্য করে বশ ছুঁড়ে মারে, ঠিক ঐ মুহূর্তে জাভেদও একটি মাছ লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে মারে।

প্রচন্ড ঢেউয়ের মাথায় নৌকাখানা ভীষণভাবে নড়ে উঠলো।

ক্যাঙ্গুরুলিংয়ের বর্শাও ঠিক সেই মুহূর্তে জাভেদের দেহ লক্ষ্য করে ছুটে গেলো কিন্তু বর্শাখানা জাভেদের দেহে বিদ্ধ না হয়ে সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়ে। ফিরে তাকায় জাভেদ। ক্যাঙ্গুরুকে দেখে বুঝতে পারে তার দেহের পাশ কেটে যে বর্শাখানা ছুটে গিয়ে সমুদ্রে অথৈ পানিতে পড়লে তা তাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছিলো ক্যাঙ্গুরুলির।

জাভেদ মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়লো ক্যাঙ্গুরুলির নৌকার উপর। চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি। ক্যাঙ্গুলির ছোট্ট নৌকা উল্টে গেলো এবং দু'জন পড়ে গেলো সমুদ্রের অথৈ পানিতে।

প্রচন্ড ঢেউয়ের বুকে শুরু হলো বিস্ময়কর যুদ্ধ।

ওদের নৌকাগুলো ভেসে এলো উচ্ছল জলরাশির প্রবল টানে।

ক্যাঙ্গুরুলির আর জাভেদ প্রচন্ড ঢেউয়ের বুকে লড়াই করছে। দুজন দুজনকে জাপটে ধরে একজন উঠছে একজন তলিয়ে যাচ্ছে ঘুষি চালাচ্ছে নাকে-মুখে-চোখে। কারো হাতে কোনো অস্ত্র নেই।

সমুদ্রের জলরাশির প্রচন্ড ঢেউ উপেক্ষা করে দু'জন যখন যুদ্ধ করছিলো তখন জিং তার নৌকা নিয়ে হাজির হলো।

সমুদ্রের তীর ছেড়ে বেশ দূরে হলেও একেবারে গভীর সমুদ্র বুকে নয়। জিং তার গন্তব্যস্থান হতে ফিরে তার প্রিয় জাভেদকে না দেখে ছুটে আসে সমুদ্রতীরে এবং সেখানে তার নৌকাখানা না দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে নৌকা নিয়ে জাভেদ সমুদ্রের বুকে মাছ শিকারে গেছে। সে বিলম্ব না করে অপর একটি ছোট নৌকায় রওয়ানা দিলো, কিছুটা অগ্রসর হতেই জিং-এর নজরে পড়লো বেশ কিছু দূরে সমুদ্রবুকে ঢেউয়ের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই চলছে।

জিং-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো দু'জন লোক একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। সে দ্রুত তার ছোট নৌকাখানা নিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলো।

প্রচন্ড ঢেউয়ের টানে কিছুক্ষণের মধ্যেই জিং-এর নৌকাখানা সেই ব্যক্তিদ্বয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

জিং অবাক চোখে দেখলো যে লোক দু'জন যুদ্ধ করছে—-ওদের একজন জাভেদ তার জীবন রক্ষাকারী, অপর জন তার চাচা ক্যাঙ্গুরুলিং।

জিং এর যত রাগ গিয়ে পড়লো চাচা ক্যাঙ্গুরুলির ওপরে। চাচা হলে কি হবে ক্যাঙ্গুরুলি একটা শয়তান একটা বেশ উপলব্ধি করতো সে। দলের মধ্যে সে সব সময় কলহ, হত্যা এমনকি সমুদ্রের পানিতে অনেককে ক্যাঙ্গুরুলিং ডুবিয়ে মেরেছে। জিং কিছুটা বুদ্ধি রাখতে, সে এইভাবে হত্যা আর খুনখারাবি পছন্দ করতো না। এ সব নিয়ে জিং বাবার কাছে নালিশ দিয়েছিলো কয়েকবার। ভাই বলে সর্দার মাঙ্গুর রেহাই দিয়েছিলো তাকে। আজ জিং সহ্য করতে পারলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রবুকে এবং ক্যাংজুরুলিকে আক্রমণ করলো।

জিং-এর কোমরে ছিলো ধারালো ছুরি।

ক্যাঙ্গুরুলিকে টেনে উঁচু করে ধরলো, তারপর ছোরাখানা সমুলে বসিয়ে দিলো ওর বুকে। তাজা লাল রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো সমুদ্রের নীল জলরাশির কিছু অংশ।

জাভেদ বিস্ময়ে স্তম্ভিত পড়লো।

সে তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে, কারণ ক্যাঙ্গুরুলিও কম শক্তিশালী ছিলো না। তাছাড়া সমুদ্রের প্রচন্ড ঢেউয়ের বুকে লড়াই। এবার জাভেদ উঠে পড়লো জিং-এর নৌকায়। জিংও সাঁতার কেটে এগিয়ে এলো এবং দ্রুত উঠে পড়লো নৌকায়।

চাচা ক্যাঙ্গুরুলির মৃতদেহটা উল্টেপাল্টে উবু হয়ে ভেসে উঠলো ঢেউয়ের মাথায়।

জিং আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

অদ্ভুত ভাষায় কিছু বললো।

জড়িয়ে ধরলো জিং জাভেদকে।

জাভেদ দীর্ঘ সময় ওদের সাথে মেলামেশায় ওদের ভাষা কিছুটা বুঝতে পারতো এবং নিজেও একটু আধটু বলতে পারতো।

জিং চাচার প্রাণহীন দেহটার দিকে অংগুলি দিয়ে দেখিয়ে বললোবাসা নোঙ্গা। রাসা নোঙ্গা,…..শব্দ দুটোর মানে হলো, মজাটা কেমন! মজাটা কেমন!

জাভেদ তাকিয়ে রইলো প্রচন্ড ঢেউগুলোর মাথায় একবার ভেসে উঠছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে ক্যাসুরুলির দেহটা।

আবার বললো জিংনানতা মোসানহুরা। মানে হলো, বাবাও চাচাকে দেখতে পারতো না।

এবার জাভেদ বললো—টারোনা কো? মানে, তাই বলে তাকে হত্যা করবে?

জিং পূর্বের মতই জবাব দিলোনানতা মোসা কো হুররা! মানে–বাবা আমাকে ধন্যবাদ জানাবে ওকে হত্যা করার জন্য।

জিং আর জাভেদ ফিরে এলো তাদের নৌকা নিয়ে।

এসব নৌকা অদ্ভুত ধরনের।

গাছের ভেতরের অংশ খুঁড়ে খুঁড়ে কেটে ফেলে খোল তৈরি করা হয়েছে। দু'পাশে ঠিক গাছের মত রাখা হয়েছে, তাই দু'পাশ দিয়ে ভেতরে পানি প্রবেশের কোনো ভয় নেই। অনায়াসে দু'তিন জন এইসব অদ্ভুত নৌকায় চলে সমুদ্রে যাওয়া যায়। গাছের ডাল দিয়েই। এরা বৈঠা তৈরি করে নেয়। রশি তৈরি করে গাছের ছাল অথবা আঁশ দিয়ে। কোনো কোনো সময় লতা দিয়েও এরা মজবুত রশি তৈরি করে। জংলীরা সমুদ্রে মাছ শিকার কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে এসব নৌকা তৈরি করে রাখে। যেন এদের সমুদ্র ভ্রমণে কোনো অসুবিধা না হয়।

জিং আর জাভেদ তাদের নৌকা নিয়ে ফিরে এলো।

কিন্তু পূর্বের নৌকাখানা জাভেদ হারিয়েছে।

ক্যাঙ্গুরুলির আক্রমণে নৌকাখানা তার কোথায় ভেসে গেছে কে জানে।

জিং জাভেদ সহ সর্দার মাংঙ্গুরুর নিকটে এলো এবং সব কথা জিং তার নিকটে বর্ণনা করলো।

সব শুনে জিংয়ের পিঠ চাপড়ে দিলো সর্দার মাংজুরু।

জাভেদ আর জিং সর্দারের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো ক্রমান্বয়ে। হিংস্র জীবজন্তু আর বন্য পশু শিকার করাই হলো তাদের প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে ওরা উৎসব করতো, সেদিন এক ধরনের রস খেতো। নাচতে গাইতে ওদের নিজেদের ভাষায়।

জাভেদ ওদেরই একজন বনে গেলো।

*

মিস লুসি ফুল্লরার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। সেদিনের পর থেকে একটি মুহূর্তের জন্য সে ওকে ছেড়ে দূরে সরে যায়নি। এমন কি রাতেও এক বিছানায়

ঘুমাতে ওরা দুজন।

জাহাজের ডেকে বসেছিলো ওরা দুজন সেদিন।

জ্যোৎস্নাভরা আকাশ।

ফুল্লরা আনমনা হয়ে যায়, সে সব সময় জাভেদকে নিয়ে ভাবে। গভীর সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছে জাভেদ, আর কোনোদিন সে ফিরে আসবে না। একটিমাত্র পুরুষকেই ফুল্লরা ভালবেসেছিলো সে হলো জাভেদ। সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে বুকটা তার হুহু করে কেঁদে ওঠে। প্রথম প্রথম নিজেকে ফুল্লরা কিছুতেই সংযত রাখতে পারতো না। ডুকরে কাঁদতো কিন্তু এখন সে পূর্বের মত কাঁদতে পারে না, লুসি খুব করে বকে। বলে, কাঁদলে কি সে আর আসবে? শুধু তোমার শরীর খারাপ হবে, লাভ হবে না কিছু। আর কাঁদতে পারবে না বলে রাখছি। তুমি কাঁদলে বাবার মন খুব খারাপ হয়, তার চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর আমিও তোমার কান্না সইতে পারি না।

ফুল্লরা লুসির কথা বোঝে।

লুসি তাকে ভালবাসে যথেষ্ট কিন্তু তার জন্য তার বাবা কষ্ট পাক এটা সে চায় না। লুসির সবসময় লক্ষ্য তার বাবা। বাবা ছাড়া আর কেই বা আছে তার, তাই ফুল্লরার দুঃখটা তার বাবাকে যেন ব্যথিত না করে এটাই সে চায়।

অবশ্য এ কারণেই লুসি আরও বেশি সজাগ ফুল্লরার প্রতি। সর্বক্ষণ কাছে থেকে নানা গল্প বলে, গান গেয়ে ওর মনকে সচ্ছ রাখার চেষ্টা করে। কখনও বা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

লুসি বললো—সব সময় তোমাকে অমন ভাবাপন্ন ভাল লাগে না ফুল্লরা। যে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না! তোমার বন্ধুটিও ফিরে আসবে না।

না না, অমন কথা বলো না লুসি। হয়তো সে বেঁচে আছে; হয়তো কোনো নাবিকদল তাকে উদ্ধার করে নিয়েছে। মরতে পারে না সে। সমুদ্র তাকে গ্রাস করতে পারে না লুসি। আমার মন বলছে সে বেঁচে আছে।

যদি তোমার কথা সত্য হয় তাহলে তো খুব ভাল। তবে তো মন খারাপ করার কিছু নেই। আচ্ছা ফুল্লরা, তোমার মন যখন এত কথা বলে তখন এ কথা জানো

না কেন সে তোমাকে অজানা অচেনা এক জাহাজে রেখে সাগরের বুকে লাফিয়ে পড়লো?

জানি না তবে আমি জানি যে বড় খেয়ালী। তার ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় ইচ্ছা। যা সে মনে করে তাই সে করে বসে, কারও বারণ জাভেদ শোনে না।

এমন লোককে তুমি কেমন করে ধরে রাখতে চাও বোন?

ছোটবেলার সাথী, হয়তো এ কারণেই তার প্রতি আমার এত আকর্ষণ। আমাকে সে ভালবাসে কি না জানি না। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসতাম প্রাণের চেয়েও বেশি। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ফুল্লরার গলা।

লুসির চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়, তবে লুসি আজও কাউকে ভালবাসেনি, তাই সে ফুল্লরার ব্যথা হয়তো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

এমন সময় ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এলেন সেখানে।

ফুল্লরা আর লুসিকে বিষণ্ণ দেখে কিছুটা উপলব্ধি করলেন তিনি নিশ্চয়ই এদের মধ্যে সেই অদ্ভুত যুবকটিকে নিয়েই আলাপ আলোচনা হচ্ছিলো। আজ নয়, অনেক সময় ক্যাপ্টেন হুই এমনিভাবে লক্ষ্য করছেন লুসি আর ফুল্লরার মধ্যে বিষণ্ন ভাব।

ক্যাপ্টেন হুই কখনও বা এসে পাশে বসতেন, এটা ওটা নিয়ে অনেক কথা বলতেন যেন ওরা ভুলে যায় গত দিনগুলোর কথা। এমন অনেক কথাই তিনি নিজের জীবন কাহিনী নিয়ে বলেছেন যা নিজকন্যা এবং কন্যা সমতুল্যা ফুল্লরার কাছে বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ ও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো।

আজ ক্যাপ্টেন আরফিন হুই যখন তার ক্যাবিন ছেড়ে ডেকে এসে কন্যা আর ফুল্লরার পাশে দাঁড়ালেন তখন তিনি লক্ষ্য করলেন ওদের মুখমন্ডল ম্লান এবং বিষণ্ন। তিনি বেশ অনুধাবন করলেন তারা এ সময় সেই ছেলেটিকে নিয়েই আলাপ করছিলো। তার সামনে ওরা চুপ হয়ে গেলো।

পরিবেশটা থমথমে মনে হচ্ছিলো।

দীর্ঘ তিন তিনটি মাস তারা জাহাজে রয়েছেন। একটানা জাহাজের ঝক ঝক শব্দ আর শুধু নীল আকাশ ও অথৈ পানি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়েনি। মাঝে মধ্যে দু'একখানা জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটেছে মাত্র।

জাহাজখানা এখন প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন দুই নিজের সন্তানের মতই ভালবাসেন তার জাহাজকে। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে এলুনের ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি আছেন। এ জাহাজের মালিকও তিনি। দেশে বিদেশে এলুনের নাম আছে, এত বড় জাহাজ খুব কমই দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন হুই তার জাহাজ নিয়ে মাথুন দ্বীপে চলেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি মাথুন দ্বীপ।

এ দ্বীপের অনেক কাহিনীই শুনেছেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই। বিস্ময় জেগেছে তার মনে, তাই তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এলুনকে নিয়ে মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে চলেছেন।

আরফিন হুই তার এই বয়সে বহু নতুন দেশ দেখেছেন—আবিষ্কারও করেছেন। অনেক নতুন জায়গা। ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু মাথুনের কাহিনী তার মনে ভীষণ একটা জানার বাসনা সৃষ্টি করেছে।

সে এক অদ্ভুত কাহিনী মাথুন দ্বীপের।

লুসি তার পিতার কাছে বারবার এই মাথুন দ্বীপ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে কিন্তু সঠিকভাবে কোনো জবাব তিনি দেন নি। শুধু বলেছেন সময় হলে সব বলবো।

কিন্তু সে সময় কবে আসবে জানে না লুসি।

এলুন এখন মাথুন দ্বীপের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। লুসির অভিমান আজও কেন তার বাবা তাকে এ দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু খুলে বলেন না।

আজ যখন ফুল্লরা আর লুসি নির্জন ডেকে বসে ছিলো তখন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন লুসি আর ফুল্লরার মধ্যে নিশ্চয়ই

এমন কোনো কথা হচ্ছিলো যা তাদের মনকে বিষণ্ণতায় ভরে তুলেছে। অবশ্য সেই অদ্ভুত তরুণটাই যে তাদের আলোচনার বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই।

লুসি তাকালো পিতার মুখের দিকে। একটু আশ্চর্য হলো সে। কারণ এমন করে বসবার সময় তার বাবার হয় না, তা সে জানে। বললো লুসি-বাবা, তুমি কিছু বলবে?

ক্যাপ্টেন আরফিন চাইলেন পরিবেশটা বদলাতে, লুসির কথায় আশ্বস্ত হলেন তিনি, সোজা হয়ে বসে বললেন–আমাদের জাহাজ প্রায় মাথুর দ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। খুব সম্ভব এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা মাথুনে পৌঁছে যাবো।

লুসি অভিমানভরা কণ্ঠে বললো—মাথুন দ্বীপে আমি পা রাখবো না কিন্তু বলে দিচ্ছি।

কেন মা?

তুমি মাথুন দ্বীপে যেতে কেন এতো আগ্রহী তা কিন্তু আজও বলোনি? নিজের মনেই তুমি গোপন রেখেছো মাথুন দ্বীপের রহস্য।

বললো বলেই তো এলাম। বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো লুসি-বোন, তুমি আজ আমাদের সঙ্গী। কাজেই আমাদের ভাল-মন্দের সঙ্গে তুমিও জড়িত। আমাদের জাহাজ মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে আরাকান থেকে রওয়ানা দিয়েছে। মাথুন দ্বীপে আমরা কেন যাচ্ছি তা আজও জানা হয়নি। বাবা ইচ্ছা করেই জানাননি এটা সত্য। জানি না কোনো গোপন রহস্য আছে কিনা এ কাহিনীর মধ্যে।

তোমাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে লুসি। সব বলবো তোমাকে।

শুধু আমি নই বাবা, আমার বোন ফুল্লরাও তোমার কথাগুলো শুনবে তবে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে।

মোটেই না। বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

ফুল্লরা চোখ তুলে ধরলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের মুখমন্ডলে। লুসির বাবা না হয়ে হুই যদি তার বাবা হতেন তবে কি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো না সে। জাহাজে তার দিনগুলো বেশ কাটছে। কোনো অসুবিধা হয় না ফুল্লরার। লুসি আর তার বাবা সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং অনেক সময় তারা নিজেরা রান্না করেও খাওয়ায়। জাহাজে নতুন কোনো সজি পাওয়ার আশা নেই তাই জাহাজের ফিরিজে প্রচুর সজি কিনে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুকনো মাংস আর পাউরুটিও ছিলো অনেক। গুঁড়ো দুধ ছিলো প্রচুর, তাই কোনো সময় খাদ্যের অভাব হয়নি।

ক্যাপ্টেন হুই আর লুসির আদর-যত্ন ফুল্লরার মন ভরিয়ে রাখতে কিন্তু তার অন্তরে শান্তি ছিলো না। জাভেদকে যদিও জীবিত পেলো তবু তাকে ধরে রাখতে পারলো না। জাভেদ ইচ্ছা করে মৃত্যুবরণ করলো, কেন তার কি একটুও মনে হলো না ফুল্লরার কথা.....

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন ফুল্লরা কিছু ভাবছে। লুসি কিন্তু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিপুল আগ্রহ নিয়ে। আর বিলম্ব না করে বললেন ক্যাপ্টেন হুই-এবার তোমরা সেই বিস্ময়কর মাথুন-দ্বীপের কাহিনী শুনবে।

বাবা, তুমি আরও কয়েকদিন এমনি করে মাথুন দ্বীপের কাহিনী শোনাবে বলেও শোনাওনি। তুমি আরাকান হতে রওয়ানা দেবার সময় যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে তাতে আমার মনে ভীষণ একটা সন্দেহের দোলা লেগেছিলো।

কেন মা? বললেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই।

লুসি বললো–যে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ সরঞ্জাম তুমি নিলে তাতে আমার মনে হচ্ছিলো আমরা বুঝি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছি কোথাও।

হাঁ মা, যুদ্ধের জন্যই তৈরি হয়েছি তবে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, সমুদ্রের সঙ্গে এই সমুদ্রতলের জলজীবদের সঙ্গে।

সে কি বাবা! আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। খুলে বলো তুমি কি বলতে চাও।

বলছি মা, বলছি। বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

ফুল্লরা বললো—বলো বাবা, লুসি বোনের যখন এতো জানার ইচ্ছা তখন তোমার বলা উচিত।

হাঁ মা, হাঁ বলবো। মাথুন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি বটে। বহু জাহাজ এই মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি যেতে চেষ্টা করেছে কিন্তু যেতে পারেনি। হয় জাহাজখানা নিখোঁজ হয়েছে নয়তো ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ মাথুন দ্বীপের রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। আমার এক নাবিক বন্ধুর একটি ডায়রী পেয়েছিলাম সে প্রায় পনরো বছর আগে। ডায়রী খানা সে কাউকে দেয়নি, রেখেছিলো যত্ন করে। কিন্তু হঠাৎ তার পরপর থেকে ডাক এলো, কঠিন অসুখে পড়লো সে। বন্ধু আমাকে লোক দ্বারা ডেকে পাঠালো তার বাসস্থানে। আমি তখন কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই বন্ধুর ডাকে তার কথামত ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলাম না। যখন গেলাম তখন বন্ধু বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, হয়তো বা বলতে চাইলো কেন আমি এত দেরী করলাম। ওর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, বালিশের তলা হতে একটি ডায়রী বের করে আমার হাতে দিলো সে। তারপর কিছু বলতে চাইলো কিন্তু বলার সুযোগ আর হলো না, চিরনিদ্রায় শায়িত হলো সে। আমি ডায়রীখানা নিয়ে ফিরে এলাম।

ডায়রীখানা কি তোমার বন্ধু নাবিকটির ছিলো? বলল লুসি।

ক্যাপ্টেন হুই বললো–হাঁ, তারই নিজ হাতে লেখা ডায়রী। নিজের বাসস্থানে এসে উল্টোপাল্টে দেখতে লাগলাম। ও আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলো তাই ডায়রীর পাতা উল্টাতে গিয়ে বার বার আমার চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছিলো।

চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিলো, কষ্ট করে তবু পড়তে শুরু করলাম। ডায়রী খানায় লেখা ছিলো, আমাদের জাহাজখানা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখনও সন্ধ্যা হয়নি তবে সূর্য ডুবতে বেশি বাকি নেই। আমরা নাবিকগণ কিছুটা ভড়কে গেলাম। মাথুনের রহস্য উদঘাটনে বহু নাবিক প্রাণ হারিয়েছে। বহু জাহাজ মাথুনের পাশে সাগরজলে সলিল সমাধি লাভ করেছে। মাথুনী দ্বীপ থেকে কেউ ফিরে যেতে পারেনি। অবশ্য এ কারণেই আমরা বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। তবুও আমাদের জাহাজখানা অগ্রসর হচ্ছে মাথুনের দিকে। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন গ্যাংগো নির্ভীক চিত্তে আমাদের জাহাজখানাকে ঠিকপথে পরিচালনা করছিলেন......একটু থেমে বললেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই–তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি ডায়রীখানা বের করে নেই।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি ঐ ডায়রীখানা সব সময় সঙ্গে থাকে?

হাঁ মা, কারণ ঐ ডায়রীখানাই আমাকে পথের নির্দেশ দেয়।

এই কারণেই তুমি আমার দৃষ্টি আড়ালে কিছু করতে? আমার কাছে কিছু গোপন করার চেষ্টা করতে.....।

মিথ্যে নয় মা, মিথ্যে নয়। মাথুন দ্বীপ নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছি। শুধু তোমার বয়স কম ছিলো, তাই মাপুন দ্বীপের চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। অবশ্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যাকে বলে যাত্রার আয়োজন।

তুমি কিন্তু সুন্দর কথা বলতে পারে বাবা।

অবশ্য এ কথা তোমার মাও বলতেন। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের কণ্ঠস্বর।

লুসি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিতার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলে– বাবা, মার কথা স্মরণ করে কেন তুমি কষ্ট পাও, বলোতো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন ক্যাপ্টেন হুই মাঝে মাঝে আমারও খুব রাগ হয়। চলেই যদি যাবে তবে কেন আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো তার! ডায়রীখানা হাতে বের করে নিয়েছেন তিনি, এবার মনোযোগ দিলেন ডায়রীর পাতায়।

ওরা বাবা আর মেয়ে যখন কথা হচ্ছিলো তখন ফুল্লরার বেশ ভাল লাগছিলো। তার মা বাবার কথা হয়তো মনে পড়ছিলো। তাকিয়ে ছিলো সে ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের চেহারার দিকে। ওর সৌম্য শান্ত চেহারা খুব ভাল লাগতো ফুল্লরার। এমন লোক না হলে হয়, স্নেহ আর মায়ায় বুকটা ভরা!

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই পড়তে লাগলেন-আমাদের জাহাজ মাথুন দ্বীপে পৌঁছবার পূর্বেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেলো সমস্ত আকাশ এবং সাগর। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি জাহাজখানা নোঙ্গর করার আদেশ দিলাম। গভীর রাতে হঠাৎ জাহাজ দুলে উঠলো, মনে হলো প্রকান্ড কোনো প্রাণী আমাদের জাহাজখানাকে উল্টে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। জাহাজের সবাই জেগে উঠলো, আমি নিজেও ক্যাবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে এলাম। জাহাজখানা কাৎ

হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি সার্চলাইট সাগরের জলে ফেললাম এবং পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। সার্চলাইট চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার একজন নাবিক চীৎকার করে উঠলো, ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন, একটা বিরাট হাত......এর পর তার কণ্ঠ আর শোনা গেলো না। আমি পেছন ডেকে গিয়ে দেখলাম নাবিকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ডেকের ওপর পড়ে আছে। জাহাজখানা তখনও ভীষণভাবে দুলছে। একদিকে কাৎ হয়ে গেছে। আমি তাড়াহুড়ো করে নাবিকটির চোখেমুখে পানি দিলাম তখন ওর সংজ্ঞা ফিরে এলো কিন্তু সে শুধু সমুদ্রের দিকে তাকাতে লাগলো। কোনো কথা সে বলতে পারছে না, দু'চোখে তার ভীষণ একটা ভীতিভাব ফুটে উঠছে। কিন্তু ওকে নিয়ে বেশীক্ষণ ভাবার সময় নেই। সমস্ত জাহাজে নাবিকগণ ছুটাছুটি করছে, সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। আমি নিজেকে সংযত করলাম, সকলের সঙ্গে আমি যদি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ি তাহলে আমার নাবিকগণ আরও মুষড়ে পড়বে। তাই মনোভাব গোপন রেখে সবাইকে সাহস দিতে লাগলাম। সংজ্ঞাহীন নাবিকটির জ্ঞান ফিরে আসতেই সে জাহাজখানার উল্টো দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো এবং বলতে লাগলো, ঐ দিকে বিরাট একটা মাথা আর ভয়ংকর দুটি চোখ। কি ভয়ংকর চোখ দুটি!......ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। আমরা যখন জাহাজটিকে সোজা করবার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেলো জাহাজের রেলিংয়ের দিকে। ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলাম, দেখলাম বৃহৎ আকার দুটি লোমশ হাত। এক একটি হাত মোটা সাল গাছ বা পাইনগাছের চেয়েও মোটা। কিন্তু পরক্ষণেই চোখের পলকে হাত দুখানা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এমন বিস্ময়কর বাহু আমি কখনও দেখিনি। বুঝতে পারলাম সামুদ্রিক দৈত্যরাজ জাহাজখানাকে উল্টো দেবার মতলব এঁটেছে। কিন্তু দৈত্যরাজের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি! এত দিন যতগুলো জাহাজ মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলো সবগুলো জাহাজ তাহলে এই সামুদ্রিক দৈত্যরাজ তলিয়ে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি আমার জাহাজ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলাগুলি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলাম নাবিকদের। ফলে বিপরীত ঘটনা ঘটলো, জাহাজখানা আশ্চর্যজনকভাবে শূন্যে উঠে এলো, তারপর আমি বুঝতেই পারলাম না, কে যেন জাহাজখানাকে সম্পূর্ণ একদিকে কাৎ করে ফেললো, আমাদের জাহাজের সমস্ত মালামাল সমুদ্রে পড়ে গেলো। এমন কি কয়েকজন নাবিকও সমুদ্রবক্ষে গড়িয়ে পড়লো। অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে আমি নিজেও জাহাজের রেলিং ধরে ঝুলতে লাগলাম। এমন সময় পুনরায় সেই দুটি বাহু আমার নজরে পড়লো, ভয়ঙ্কর দুটি লোমশ হাত। জাহাজখানাকে ধরে শূন্যে তুলে

রেখেছে, কি আশ্চর্য! দীর্ঘকাল ধরে সাগর আর জাহাজ নিয়ে আছি কিন্তু এমন অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি।

এতক্ষণ লুসি আর ফুল্লরা নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো। এবার লুসি বললো–বাবা, তোমার কি মনে হয় ওটা সামুদ্রিক জীব? না অন্য কোনো কিছু।

মা লুসি, তোমার মত আমারও মনে ভীষণ বাসনা এই বিষয়ে। আমারও মনে একই প্রশ্ন-ঐ জিনিসটা কি সত্যি বলতে কি জানার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এ যাত্রা। প্রথমে বললে তোমরা হয়তো খুব ভয় পেয়ে যেতে; তাই এতদিন বলিনি।

বাবা, তুমি জানো না তোমার মেয়ে তোমার চেয়ে কম দুঃসাহসী নয়। তোমার বন্ধুর ডায়রীখানা আমাকে যদি দিতে আমি অনেক আগেই মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করতাম।

সত্যি মা লুসি

হাঁ বাবা। আমাকে তুমি যতখানি ভীতু মনে করো আসলে কিন্তু আমি তা নই।

মা, দীর্ঘ সময় ধরে ঐ অপেক্ষায় ছিলাম কবে তুই বড় হবি। তোকে নিয়ে মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে এবং সেই রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করবো যা আমার বন্ধু পারেনি। সে বার বার অনুরোধ করে গেছে আমি যেন এই রহস্য উদঘাটনে পিছপা না হই।

বাবা, তোমাকে আমি নিজে সাহায্য করবে। বলল লুসি। তারপর ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো–বোন, তুমি পারবে না আমাদের এ কাজে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা করতে?

ফুল্লরা বললো—-পারবো। সত্যি, জাভেদ যদি আজ থাকতো তাহলে হয়তো সে তোমাদের এই ভয়ংকর রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করতে পারতো। কারণ জাভেদ খুবই দুর্ধর্ষ আর তার শক্তিও অসীম।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বললেন–ফুল্লরা মা যা বললো তা সত্য। অমন সাহসী শক্তি শালী ছেলে সঙ্গে থাকলে অবশ্য ভালই হতো। আমাদের অনেক উপকার হতো।

বাবা, তুমি তোমার বন্ধুর ডায়রীখানা পড়ে শেষ করে ফেলো। এরপর আর নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না।

হাঁ মা পড়ছি, আর বেশি নেই। আবার আরফিন হুই পড়তে শুরু করলেন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছি। তাড়াতাড়ি শক্ত করে ধরলাম হাতের পাশের রেলিংটা। তারপর কি ঘটে গেলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমাদের জাহাজখানা খেলনা জাহাজের মত কাৎ হয়ে পড়লো। তারপর তলিয়ে গেলো গভীর জলের তলায়।

সর্বনাশ, তাহলে তোমার বন্ধু ডায়রী লিখলেন কখন বাবা? বললো ফুল্লরা।

আজকাল ফুল্লরাও লুসির সঙ্গে তার বাবাকে বাবা বলেই ডাকে। ওকে বাবা বলতে একটু তার দ্বিধা হয় না, কারণ লুসি তাকে বোনের মতই দেখে এবং সেও লুসিকে আপন বোনের মতই মনে করে।

লুসি বললো—নিশ্চয়ই ডায়রী লিখবার সুযোগ তার এসেছিলো তাই সে তার এই রহস্যময় ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছে।

হাঁ, জাহাজখানাকে সেই ভয়ংকর জীবটা তলিয়ে দিলেও আমার বন্ধ হ্যারিসনকে তলিয়ে দিতে পারেনি। সে একটি লাইফবয় খুলে নিতে সক্ষম হয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত ঐ লাইফবয় নিয়েই হ্যারিসন মাথুন দ্বীপে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তার সঙ্গীসাথিগণ মানে অন্যান্য নাবিকের কি পরিণতি হলো? বলল লুসি।

সে কথাও আমার বন্ধুর ডায়রীর পাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

বলল বাবা তারপর? বললো লুসি।

তারপর লাইফবয়খানা নিয়ে অতি কষ্টে আমার নাবিক বন্ধু ঠিক তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলো, সেই মাথুন দ্বীপে।

তুমি পড়ো বাবা, আমার বড় শুনতে ইচ্ছা করছে।

হাঁ মা পড়ছি, আবার ক্যাপ্টেন আরফিন পড়তে শুরু করলেন, আমি জাহাজখানা তলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি লাইফবয় খুলে নিয়েছিলাম।

জাহাজখানাই শুধু তলিয়ে গেলো না, জাহাজের সঙ্গে আমার সবকিছু আমি হারালাম। বিশ্বস্ত কয়েকজন নাবিক বন্ধু এবং ক্যাপ্টেন মার্গকে চিরদিনের জন্য হারালাম। তারপর কোনো রকমে ভেসে চললাম লাইফবয়খানা নিয়ে। তখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে বিরাট আকার দুটি লোমশ বাহু। আমি লাইফবয় নিজে জীবন রক্ষা পেলেও ভরসা পেলাম না, ভয় হলো কোন্ মুহূর্তে সেই সামুদ্রিক জীবটা আমাকে সামান্য একটি ভাসমান পিপীলিকার মত পিরেট হত্যা করবে। কিন্তু জানি না কেন আমি জীবিত রইলাম। যেদিন যখন এই ডায়রী লিখছি তখন অবশ্য আমার মনে বারবার এই কথাটি উদয় হচ্ছে, কেন আমি মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলাম, কেন ব্যর্থ হলাম। সমুদ্রের সেই ভয়ংকর জীবটা শুধু আমাদের জাহাজটাকেই ধ্বংস করেনি। ধ্বংস করেছিলো আরও বহু জাহাজ এবং জাহাজের অনেক মূল্যবান জীবন। আমার উদ্দেশ্য সফল না হলেও আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি সেই ভয়ঙকর সামুদ্রিক জলজীবটাকে। এই জীবটা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি কোনো ডুবু পর্বতের গুহায় বাস করে। কোনো জাহাজ নেই পথে এসে পড়লেই সেই জীবটা ডুবু পর্বতের গুহার ভেতরে থেকে বেরিয়ে জাহাজটিকে আক্রমণ এবং ভেঙে গুঁড়িয়ে তলিয়ে দেয়। কিন্তু জীবটার কথা কেউ ফিরে এসে কাউকে জানাতে পারেনি কোনোদিন। মাথুনদ্বীপের কাছাকাছি ডুবুপর্বত আছে সেই পর্বতের গহ্বরে আত্মগোপন করে আছে এই জীবটা। একে হত্যা না করা পর্যন্ত মাথুন দ্বীপে কেউ পৌঁছতে পারবে না। আমি মাথুন দ্বীপে আমার লাইফবয় নিয়ে পৌঁছে যা দেখলাম তা বড়ই বিস্ময়কর। এ দ্বীপে কোনো প্রাণী নেই, শুধু বালুকারাশি আর ছোটবড় পর্বতমালা। অনেক অজানা বৃক্ষলতাগুল্ম দেখলাম। বন-জঙ্গল নদী-নালা আছে শুধু নেই কোনো জীবজন্তু। বনে-জঙ্গলে নানা ধরনের ফলের গাছ দেখতে পেলাম। ক্ষুধার্ত ছিলাম তাই এইসব ফল খেয়ে তৃপ্ত হলাম। বহু ফল গাছের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেখানেই পেকে পঁচে তার বীচি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আবার একটি বৃক্ষ। এমনি করে বৃক্ষালতা বেড়েই চলেছে, নষ্ট করার বা খাবার কেউ নেই।

ক্ষুধা পেলে ফল খাই এবং পিপাসা পেলে ঝরণার সচ্ছ পানি পান করি। আমার লাইফবয়খানাকে আমি যত্ন করে রেখে দিলাম একটি নির্দিষ্ট স্থানে। যেখানেই যাই যতদূরেই যাই না কেন, আমার লাইফবয়টার কাছে আবার ফিরে আসি। এই নির্জন মাথুন দ্বীপে ঐ লাইফবয়টা যেন আমার সবচেয়ে আপনজন। মাঝে মাঝে আমি ওর সঙ্গেই বা কথা বলি, আমি বুঝতে পারি ও আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না বা বলতেও পারবে না, তবুও বলি। ওর সঙ্গে কথা না বলেই কি উপায় ছিলো। সত্যি কথা বলতে কি, আমার খুব ভাল লাগছিলো মাথুন দ্বীপ। কোনোদিন কারও

মুখে এমন দ্বীপের কাহিনী শুনিনি বা দেখিনি। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি দ্বীপ। একটি পাখীও আমার নজরে পড়লো না, এমনকি পিপীলিকাও নেই সে দ্বীপে। রাত্রিকালে আকাশে চাঁদ ওঠে, দিনের বেলায় সূর্য ওঠে, আবার সূর্য অস্তমিত হয় আমি দেখি। বড় সুন্দর মনোরম এ দৃশ্য! বেশ কয়েক দিন কেটে গেলো, সমুদ্রের কাছ-কাছিই ঘুরে ফিরে দেখছি, দূরে যাই না যদি কোনো বিপদে পড়ি। আমার লাইফবয়টিকে আমি একা রেখে যেতে চাইনে। তবুও একদিন চললাম, দ্বীপটা আমার ভালভাবে দেখতে হবে।

সমস্ত দিন ধরে এগুচ্ছি। সমুদ্রতীর ছেড়ে বহুদূরে এসে পড়েছি। হঠাৎ আমার চোখ দুটো। বিস্ময়ে স্থির হয়ে পড়লো। দেখলাম মাটি আর বালির মধ্যে কিছু চক চক করছে। তাড়াতাড়ি হাতে উঠিয়ে নিলাম এক মুঠো। বালি আর মাটির সঙ্গে দেখলাম রাশি রাশি স্বর্ণকণা। চোখ দুটো আমার ছানাবড়া হয়ে গেলো, পাশে যদি কেউ থাকতো জড়িয়ে ধরতাম বুকে আনন্দে আতিশয্যে। কিন্তু আমি একা, সম্পূর্ণ একা। তবুও উল্লাসিতভাবে চিৎকার করে বললাম, ঈশ্বর, তুমি আমাকে এমন এক জায়গায় এনেছে যা আমি কল্পনা করতে পারিনি। আমাকে এ দ্বীপ থেকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে চলো—আবার যেন আমি এ দ্বীপে আসতে পারি। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবান আমি, কারণ মাথুন দ্বীপ শুধু আমার–আমি......আমি আবিষ্কার করেছি স্বর্ণরাণী মাথুনকে।

ঈশ্বর সেদিন আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন কিনা জানি না, এর পরও আমাকে দীর্ঘ সময় এই দ্বীপে কাটাতে হলো। আমি দ্বীপটা যতই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছি ততই আমার আরও বেশি জানা বা দেখার বাসনা জাগছিলো। মাটি আর বালির সঙ্গে শুধু সোনা আর সোনা। একটি জাহাজ নিয়ে যদি আসতাম তাহলে আমি হতাম পৃথিবীর সবচেয়ে ধ্বনি আর সম্মানী। কিন্তু পারবো কি আর ফিরে যেতে বারবার এ কথাই মনে হচ্ছিলো তখন।

ক্রমে মনটা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো। আমি মানুষ তো! একা নিঃসঙ্গ থাকার অভ্যাস আমাদের নেই। বার বার মনে পড়তে লাগলো আমার নাবিক বন্ধুদের কথা। ওরা সাগরের জলে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। সেই ভয়ঙ্কর জীবটার কথাও আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিলো। ভয়ে শিউরে উঠতাম ওর কথা মনে পড়লে। যদি সে এসে পড়ে এই দ্বীপে তাহলে আমাকে ছোট্ট একটা পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে দূরে বহুদূরে। হয়তো বা পা দিয়ে পিষে মারবে। থেতলে চ্যাপ্টা করে দেবে আমার হাড়গোড়-মাংস।

প্রতিদিনের মত ক্ষুধা পেলে যেমন গাছ থেকে পাকা ফল পেড়ে খাই তেমনি একদিন একটা ছোট্ট গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে নিয়ে খেলাম। মাত্র দুটো ফল খেয়েছি তারপর কিছু মনে নেই। যখন আমার সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন দেখলাম আমার মাথাটা ভীষণ ঘুরপাক খাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতে গেলাম পা দুখানা টলছে। আবার বসে পড়লাম। আমার সম্মুখে ফলগুলো তেমনি পড়ে আছে দেখলাম। ভীষণ ভয় লাগলো, ফলগুলো হয়তো বিষাক্ত ফল। জীবনে যে বেঁচে আছি এটাই আমার ভাগ্য।

এরপর হতে হঠাৎ আর কোনো ফল খেতাম না। যে ফলগুলো প্রথম প্রথম খেলে জীবন ধারণ করেছি, ঐ ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে লাগলাম। ভুলেও আর কোনো দিন অজানা ফলে হাত দিলাম না। রোজ সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ভাবতাম কোনো জাহাজ যদি এ পথে এসে পড়ে তাহলে আমি হয়তো ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হলো না।

এমনি করে একটি বছর আমার কেটে গেলো মাথুন দ্বীপে। দাড়ি গোঁফ আর মাথার চুলে আমি বনমানুষে পরিণত হলাম। আংগুলের নখগুলো বড় হয়ে বিকৃত আকার হলো। আমাকে ঐ মুহূর্তে সভ্য সমাজের যে কোনো মানুষ দেখলে ভয় পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাথার চুল জট ধরে গেছে, কারণ বহুদিন চিরুণীর আঁচড় পড়েনি। জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করছি মাত্র। অবশ্য যে দ্বীপে আমি বাস করছি তাতে লজ্জা নিবারণের কোন প্রয়োজন ছিলো না। তবুও মানুষ তো তাই একেবারে উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারলাম না।

সোনা আর মাটি দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু দীর্ঘ একটি বছর কেটে যাবার পর আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। শুধু ফল আর পানি পান করে কত দিন জীবন ধারন করা যায়। তাছাড়া জনমানবহীন ভয়াবহ এক দ্বীপ, রাত আরদিন সব আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। একদিন আমি আমার প্রিয় সাথী লাইফবয়টা নিয়ে সাগরের বুকে নেমে পড়লাম।

অবশ্য একবার আমার মনে জেগে উঠলো সেই ভয়ঙ্কর জীবটার কথা। যদি কোনোক্রমে তার কবলে পড়ে যাই তাহলে আর রক্ষা নেই, মৃত্যু অনিবার্য। তবুও লাইফবয় নিয়ে চললাম। সাগরের নোনা পানিতে গা-মুখ-চোখ জ্বালা করতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, চলছি সাগরের ঢেউয়ের বুকে ভেসে ভেসে।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে, আমার লাইফবয়খানা প্রকান্ড ঢেউগুলোর উপর দিয়ে আমাকে দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে চললো। দুদিনের মধ্যেই আমি মাথুন দ্বীপ হতে বহুদূরে চলে এলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো তবুও আমি আমার জীবনসাথী লাইফবয়টাকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে রাখলাম। এখন আমি মানুষ নই, সামুদ্রিক একটি প্রাণী–আমার তাই মনে হচ্ছিলো।

কিছু ভাবনা-চিন্তা করবার মত মনের অবস্থা যদিও ছিলো না তবুও বাঁচবার একটা বিপুল আগ্রহ আমাকে প্রেরণা যোগাচ্ছিলো। আমি মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছিলাম। তাই হয়তো ঈশ্বর আমার পানে মুখ তুলে চাইলেন।

তৃতীয় দিন হঠাৎ একটি জাহাজ আমার নজরে পড়লো। আমি খুশি হলাম কিন্তু জাহাজখানা আমার থেকে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিলো, কাজেই জাহাজের কেউ আমায় দেখতে পাবে না বলেই আমার ধারণা হলো। আমি হতাশ হলাম, হঠাৎ আমার মনে হলো জাহাজখানার গতি মন্থর হয়ে আসছে। তারপর এদিকে মাথাটা ফেরালো। তবে কি জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে দেখতে পেয়েছে! ঐ তো এদিকে আসছে জাহাজখানা।

হাঁ, জাহাজখানা এগিয়ে এলো। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছিলো। আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই ঠিক, ওরা আমাকে লাইফবয়ে ভাসতে দেখেছে এবং এ কারণেই জাহাজটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা আমার কাছে পৌঁছে গেলো। জাহাজ থেকে ঝুলন্ত সিঁড়ি এবং স্পীডবোট নামানো হলো, তারপর আমাকে স্পীডবোটে তুলে নিয়ে জাহাজে নিয়ে এলোর উদ্ধার পেলাম। অজানা অচেনা মুখ। সবাই মনে করলো জাহাজডুবিতে আমার এ অবস্থা হয়েছে। আমি এত বেশি ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছিলোম যে, তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলাম না। ওরা আমাকে একটি ক্যাবিনে রেখে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। জাহাজের সকলেই আমার চেহারা এবং পরিধেয় ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র দেখে ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলো। কি রহস্য আমার ভেতর লুকিয়ে আছে জানার জন্য ওরা উদ্বিগ্ন এবং আগ্রহী হয়ে উঠলো।

কয়েকদিনে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলাম।

লুসি বলে উঠলো—-উঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতক্ষণে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো, না জানি কোন বিপদে আবার পড়ে তোমার বন্ধুটি। ইস,. কি বিপদটাই না কেটে গেলো তার.........

কিন্তু বিপদ কাটলো আর কই! ফিরে এসে কিছুদিন বেঁচেছিলো মাত্র, তারপর চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে তার বিস্ময়কর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে।

বাবা, সত্যি নাবিক বন্ধুর কাহিনী শুধু বিস্ময়কর নয়, একেবারে অদ্ভুত আর ভয়াবহ। পড়া বাবা তারপর?

এই তো মা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পড়ছি শোন মা তোরা শোন, কারণ শোনা দরকার। আর এমন বিপদ আমাদের জীবনেও আসতে পারে, কারণ আমরা যে স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি সে স্থান ঐ মাথুন দ্বীপ। যে দ্বীপে পৌঁছানো অসম্ভব বলা যায়। পড়তে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই, ওরা আমাকে ধরে বসলো কেমন করে আমার এমন অবস্থা হলো। আমি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বললাম। জাহাজের বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন গ্যাংগো আমার কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-মাথুন দ্বীপের ডুবুপর্বত সম্বন্ধে আমি অবগত আছি, তবে সেই পর্বত গহ্বরের রহস্য আমি জানতাম না। এই ভয়ংকর জীবটাই যে মাথুনের নিকটবর্তী হতেই জাহাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর আমি স্বদেশে ফিরে আসি কিন্তু আমার সমস্ত মন জুড়ে একটা বিপুল দুঃখ আর আফসোস আমাকে দগ্ধীভূত করতে থাকে। মাথুনের মাটি আর সোনা সব সময় আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। কোনো কাজে আমার মন বসে না। দিন দিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

আমার স্ত্রী এবং সন্তানগণ আমার চুল-দাড়ি-গোঁফ কেটে দিয়ে আমাকে পূর্বের মত সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। আমার জন্য ডাক্তার এলেন, ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আমি দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো প্রিয় বন্ধু। ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের কথা, যদি তাকে এ মুহূর্তে কাছে পেতাম তাহলে সব বলতাম। মাথুনের মাটি আর সোনা যদি সে আনতে পারতো তাহলে আমি কিছুটা স্বস্তি পেতাম। কিন্তু সে কোথায় কে জানে, তার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা জানি না......আজকাল লিখতে পারি না, একটু লিখতেই হাত কাপে, চোখে অন্ধকার দেখি। হয়তো প্রশান্ত মহাসাগরের

নোনা পানি আমার দেহের সমস্ত রক্ত পানি করে দিয়েছে, তাই কোনো ওষুধ আমার কাজে লাগছে না। আমি বুঝতে পারছি আর বাচবো না। কিন্তু আমার আমার প্রিয় বন্ধু ক্যাপ্টেন আরফিন হুইকে চাই……

বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের গলা, তিনি হাতের পিঠে চোখ মুছলেন, তার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে এলো।

লুসি বললো–বাবা, তোমার বন্ধুর ডায়েরী সত্যি বিস্ময়কর। আজ বহুদিন কেটে গেছে তবুও তার ডায়েরী পড়তে গিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি ব্যথা পাচ্ছো।

মা লুসি, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, সে আমাকে কত ভালবাসতো।

হাঁ বাবা, তোমাকে তিনি ভালবাসতেন বলেই তো তিনি আর কাউকে এ ডায়েরী দেননি, তোমাকে দিয়ে গেছেন।

লুসি, দীর্ঘকাল ধরে এ ডায়েরীখানা আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। শুধু তোর মুখের দিকে চেয়ে আমি মাথুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিনি। জানতাম আমি ছাড়া তোর আর কেউ নেই যার কাছে তোকে রেখে যাবো। তাই প্রতীক্ষা করছিলাম কবে তুই বড় হবি, বুঝতে শিখবি, যখন আমার কাজে বাধা দিবি না……

বাবা, এবার তোমার বাসনা পূর্ণ হলো তো

কই মা, এখনও পূর্ণ হলো কই! যখন মাথুন দ্বীপে পা রাখবো তখন আমার বাসনা পূর্ণ হবে।

কিন্তু আমার বড় ভয় করছে যদি তোমার বন্ধুর অবস্থা আমাদেরও হয় তাহলে কি হবে বাবা?

ওসব চিন্তা করতে নেই। আমরা চেষ্টা করবো জয়যুক্ত হতে। মাথুনের রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে মা লুসি।

ফুল্লরা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো—সেই ভুতুপর্বতমালার গহ্বর থেকে যদি ঐ জীবটা আবার বেরিয়ে আসে তাহলে?..

অনেক অস্ত্র-গোলা-বারুদ নিয়েছি। আমি দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুতি নিয়ে তারপর অগ্রসর হয়েছি এই দুঃসাহসিক অভিযানে। আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন। তিনিই আমাদের সহায়। জাহাজখানা আমাদের কোনো এক দ্বীপের কাছাকাছি দিয়ে এগুচ্ছে এখন। এই দেখো আমার ম্যাপখানা একবার লক্ষ করে দেখো মা লুসি। ক্যাপ্টেন আরফিন হুই ডায়েরীখানা পকেটে রেখে একটি ভাজকরা কাগজ মেলে ধরলো সম্মুখের ডেকের মেঝেতে।

ফুল্লরা আর লুসি ঝুঁকে দেখতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এই দ্বীপটার কাছাকাছি দিয়ে আমাদের জাহাজ চলছে যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা, মাথুন দ্বীপ কোনটা? ম্যাপখানার দিকে চোখ রেখে বললো লুসি।

ক্যাপ্টেন আরফিন আংগুল দিয়ে দেখালেন–এই যে মা এটা মাথুন দ্বীপ। এই সেই সোনা আর মাটি মেশানো দ্বীপ। আমরা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি এসে গেছি।

বাবা, ঐ দেখো আকাশে পাখি উড়ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো ফুল্লরা।

লুসি আনন্দধ্বনি করে ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরলো–আঃ কি আনন্দ, আমরা দীর্ঘ তিন মাস পর মাটির ছোঁয়া পাবো! বাবা, তুমি যা বললে তাই ঠিক। ঐ দেখো পাখি উড়ছে আকাশে। নিশ্চয়ই আমরা কোনো দ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছে গেছি। আমাদের জাহাজখানাকে নোঙ্গর করতে বলো সেই অজানা দ্বীপে, যে দ্বীপে বাস করে ঐ পাখিগুলো।

হাঁ মা, আমার ইচ্ছাও তাই। মাথুনের দিকে এগুবার পূর্বে একবার মাটির স্পর্শ পেলে মনটা তৃপ্ত হতো। আমি সারেঙ্গকে বলে দিচ্ছি ..

বাবা, দেখো দেখো দূরে বহু দূরে জঙ্গলভরা তীর দেখা যাচ্ছে।

হাঁ মা, সত্যিই বলেছিস।

এমন সময় দু'জন নাবিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। একজন বলে ওঠে–ক্যাপ্টেন, আমরা তীর দেখতে পেয়েছি। আমাদের জাহাজ কোনো দ্বীপের পাশ দিয়ে চলেছে......নাবিক দেখলো ক্যাপ্টেন আরফিন, লুসি আর ফুল্লরার সম্মুখে একটি ম্যাপ বিছানো রয়েছে। নাবিক দু'জন বুঝতে পারলে তারা বলবার পূর্বেই ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরেছেন তাদের জাহাজ এখন কোনো এক দ্বীপের কাছ দিয়ে এগুচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন বললেন-তোমরা সারেঙ্গকে জাহাজ দ্বীপটার দিকে নিয়ে যেতে বলো। তবে একেবারে তীরের নিকটে না যাওয়াই শ্রেয়, কারণ অজানা দ্বীপ, আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে কিনা কে জানে।

আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আপনার নির্দেশ সারেঙ্গকে জানিয়ে দিচ্ছি।

লুসি তার পিতাকে লক্ষ্য করে বললো—বাবা, আমার কিন্তু খুব আনন্দ লাগছে। বোন ফুল্লরা, তোমার কেমন লাগছে বললে না তো?

ঠিক তোমার মত খুশি লাগছে আমারও, কিন্তু......

বলো থামলে কেন?

আজ যদি জাভেদ আমাদের পাশে থাকতো তাহলে......

তাহলে আমরা সবাই পূর্ণ আনন্দ অনুভব করতাম। কথা বলতে গিয়ে লুসি উচ্ছল। আনন্দে চিৎকার করে উঠলোঐ দেখো আমরা তীরের বেশ কাছাকাছি এসে গেছি।

হাঁ মা, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অজানা দ্বীপটার প্রায় নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হবো। তবে আশংকা আছে এ সব দ্বীপে ভয়ংকর জীবজন্তু এবং বিষধর সাপ বাস করে। তারা মানুষের গন্ধ পেলে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসে। এসব আমার জীবনের বাস্তব ঘটনা।

তা ঠিক বাবা, কিন্তু তাই বলে আমরা সাগরবক্ষ থেকেই ফিরে যাবো না। দেখতে চাই দ্বীপটা কেমন এবং এখানে কারা বাস করে।

বেশ, তাই হবে। যাও ক্যাবিনে গিয়ে তোমরা কিছু খেয়ে নাও, আমি আমার ক্যাবিনে গিয়ে দেখি জাহাজখানা কোন পথে এগুচ্ছে।

তুমি এখন কিছু খাবে না বাবা?

না মা, এখন কিছু খাবো না, তোমরা যাও।

তা হবে না, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে আমাদের ক্যাবিনে আসতে হবে। অনেকক্ষণ থেকে তুমিও কিছু খাওনি।

ছাড়বে না যখন তখন চলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই, লুসি আর ফুল্লরা তাদের ক্যাবিনে এসে বসলো। লুসি নিজের হাতে কফি তৈরি করে পিতা ও ফুল্লরাকে দিলো, তারপর নিজে এক বাটি নিয়ে বসলো।

কফি খেতে খেতে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিলো, যদিও তাদের তাড়াহুড়ো ছিলো তবুও তারা ভুলে গেলে তাদের জাহাজ একটা নতুন দ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। তাদের জাহাজখানা অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছিলো তাই কিছু সময়ের মধ্যে তাদের জাহাজ প্রায় তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

হঠাৎ একজন নাবিক তাদের ক্যাবিনে ছুটে এলো, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো—ক্যাপ্টেন, আমাদের জাহাজখানা তীরের সন্নিকটে এসে পড়েছে। অসংখ্য বর্শা এসে পড়ছে আমাদের জাহাজের গায়ে। আমরা কেউ বাইরে ডেকে বের হতে পারছি না। বর্শার সঙ্গে তীরও এসে পড়ছে জাহাজের সম্মুখভাগে। আমাদের একজন নাবিকও নিহত হয়েছে……

বলো কি, আমাদের জাহাজের একজন নাবিক নিহত হয়েছে।

হাঁ, তীরবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটেছে। বিষাক্ত তীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্যাপ্টেন, আপনি বাইরে বের হবেন না। হয়তো বর্শা বা তীরে এসে আপনার দেহে বিদ্ধ হতে পারে।

লুসি আর ফুল্লরা চোখে অন্ধকার দেখছে। কোথায় তারা মাটির বুকে পা রেখে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে তা নয়, উল্টা নতুন এক বিপদ এসে দেখা দিলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের মুখমন্ডল চিন্তান্বিত হলো।

লুসি বললো–বাবা, জাহাজ ফেরাতে বলো। আমরা মাটির আস্বাদ আর চাই না। কি বলো ফুল্লরা।

ফুল্লরার মুখও ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, সে কোনো জবাব দিলো না লুসির কথায়। অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তারা এবার মাটির বুকে নামতে পারবে। কতদিন সে মাটির ছোঁয়া পায়নি। আবার মনে পড়ে গেলো জাভেদের কথা। কেন যেন আজ নতুন করে তার মনে উদয় হচ্ছে সেই মুখখানা। এত বিপদ জেনেও তার বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে, জীবন রক্ষার জন্য আত্নগোপন করে থাকাটা যেন বোকামি।

ক্যাপ্টেন হুই ক্যাবিনের পাশ কেটে উপরে উঠে গেলেন এবং বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে তীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তখনও অসংখ্য তীর আর বর্শা ছুটে আসছে জঙ্গলের ভেতর থেকে। ক্যাপ্টেন আরফিন হুই নাবিকগণকে রাইফেল থেকে সমুদ্রতীর ও বন-জঙ্গল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে নির্দেশ দিলেন।

নাবিকগণ তাই করলো।

তারা গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

এক তরফ থেকে গোলাগুলি আর এক তরফ থেকে তীর আর বর্শা নিক্ষেপ হতে লাগলো। ক্যাপ্টেন হুইয়ের আদেশে জাহাজখানা পিছু হটতে শুরু করলো। চলে এলো ওদের নাগালের বাইরে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলেন। তীর থেকে সরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে অসংখ্য জংলী তীর আর বর্শী নিক্ষেপ করছে। কয়েকজন জংলী ধরাশায়ী হয়েছে নাবিকদের গুলীর আঘাতে। হঠাৎ দৃষ্টি থেমে গেলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের! জংলীদের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। সুন্দর সুঠাম এক তরুণ। কি আশ্চর্য, তরুণটির চেহারা তার কাছে যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। যদিও মুখখানা তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এই তরুণটিই মনে হয় জাভেদ–যে তার জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো।

বাইনোকুলারে তিনি ঠিক চিনতে পারতেন কিন্তু জাহাজখানা বেশ দূরে সরে এসেছে। তীর ছেড়ে, এই কারণে কিছুটা সন্দেহ জাগছিলো তার মনে। তীর-ধনু হাতে দাঁড়িয়ে আছে তরুণটি তার পাশে আরেকটি তরুণ, তার হাতেও তীর-ধনু। ঐ তরুণটিই কি জাভেদ? না না, সে কি করে জীবিত থাকতে পারে? প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জীবন্ত কোনো মানুষ পড়ে গেলে সে বাঁচতে পারে না। প্রচন্ড ঢেউ আর হাঙ্গর-কুমির ও হিংস্র জলজীব তাকে বাঁচতে দিতে পারে না। কিন্তু...... কেমন যেন সন্দেহ জাগছে মনে। ক্যাপ্টেন আরফিন তার বাইনোলারখানা পাশের নাবিকের হাতে দিয়ে বললেন—সম্মুখে ঠিক বাঁ দিকে ঐ বড় গাছটার পাশে তাকিয়ে দেখো তো! ঐ তরুণটি কি জংলীদের একজন?

নাবিক তাড়াতাড়ি কাপ্টেন, আরফিন হুইয়ের হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে চোখে লাগালো এবং পরক্ষণেই প্রায় চিৎকার করে বললো–ক্যাপ্টেন, এই সেই তরুণ যাকে আমরা সাগরের বুক থেকে বাক্সবন্দী অবস্থায় তুলে এনেছিলাম। যে আমাদের জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো।

দেখি দাও তো আমাকে বাইনোকুলারখানা। ক্যাপ্টেন হুই আবার বাইনোকুলার হাতে নিলেন এবং চোখে লাগিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। আবার অপর একজন সহকারীর হাতে দিয়ে বললেন হুই–তুমি দেখো দেখি এই তরুণ কি সেই তরুণ যাকে আমরা ভাসমান বাক্সের মধ্যে পেয়েছিলাম।

ঐ ব্যক্তি বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ভালভাবে বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করে দেখে বললো—আমি নিশ্চয় করে বলছি এ সেই তরুণ তাতে কোনো ভুল নেই।

আরফিন হুই এত বিপদেও আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি যে পথে উপরে উঠে এসেছিলেন সেই পথে নেমে এলেন। ব্যস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন–মা লুসি, তাকে পাওয়া গেছে......তাকে পাওয়া গেছে....

কাকে পাওয়া গেছে বাবা? পিতাকে আনন্দভরা কণ্ঠে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয় ওরা দু’জন-ফুল্লরা আর লুসি।

আরফিন হুই আংগুল দিয়ে ক্যাবিনের জানালাপথে দূরে জঙ্গলের দিকে দেখিয়ে বললেন–ঐ জঙ্গলে সে আছে। তাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি..

কাকে দেখেছো বাবা, বলবে তো? পুনরায় বললো লুসি।

ফুল্লরার চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ওরা কেউ বুঝতে পারছে না কার কথা বলছেন ক্যাপ্টেন হুই।

ক্যাপ্টেন আরফিন এবার বললেন–ফুল্লরার সাথী সেই তরুণটি যার নাম জাভেদ। যে জাহাজ থেকে....

আনন্দ ও উত্তেজনায় ফুল্লরা চিৎকার করে উঠলো-কোথায় সে বাবা?

লুসিও বলে উঠলো—কোথায় তাকে দেখলে? সত্যি তাকে দেখেছো?

হাঁ মা, সত্যি দেখেছি সেই ছেলেটিকে। ঐ অসভ্য জংলীদের মধ্যে সেও আছে। তার হাতেও তীর-ধনু দেখলাম।

ফুল্লরার চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্য ক্যাবিনের দরজার দিকে অগ্রসর হতেই লুসি তাকে ধরে ফেলেনা, না, বাইরে যেও না ফুল্লরা। ওরা তোমাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করবে।

ফুল্লরা বলে উঠলো—আমাকে বাধা দিও না বোন! জাভেদ, সত্যি আমার জাভেদ বেঁচে আছে! আমি তাকে দেখবো......

বললেন ক্যাপ্টেন আরফিন–মা, তোমাকে আমি আমার ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে বাইনোকুলার চোখে দিয়ে দেখাচ্ছি। তুমি তাকে দেখতে পাবে! তুমি তাকে দেখতে পাবে......

চলো বাবা, তোমার ক্যাবিনে চলো। ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের সঙ্গে লুসি আর ফুল্লরা তার ক্যাবিনে এলো। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো লুসি প্রথমে। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো–ঠিক চিনতে পেরেছি। ফুল্লরা ও বেঁচে আছে! ও বেঁচে আছে! সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তার মৃত্যু ঘটেনি। ঐ তো তাকে দেখতে পাচ্ছি।

কই কোথায় সে? ফুল্লরা এবার বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে দেখলো তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আনন্দ অশ্রু, আবেগে কণ্ঠ যেন তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর বললো—-বেচে আছে! আমার জাভেদ বেচে আছে...কিন্তু সে গহন বনের দিকে চলে গেলো জংলীদের সঙ্গে। তাকে আমরা কি করে ফিরিয়ে আনবো?

লুসি ফুল্লরার কাঁধে হাত রেখে বললো—তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কোনো বুদ্ধি বের করতে হবে। বাবা নিশ্চয়ই তাকে এই জঙ্গলে অজানা দ্বীপে রেখে চলে যাবেন না। বাবা, চুপ করে আছো কেন, কথা বলো?

ফুল্লরাও ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের দিকে।

ক্যাপ্টেন আরফিনকে ভাবাপন্ন লাগছিলো, তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন বলে মনে হলো। লুসির কথায় বললেন তিনি–জাহাজখানা এখন ওদের বর্শা আর তীরের লক্ষ্যের বাইরে চলে এসেছে। জাহাজ এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কারণ ওকে যখন পাওয়া গেলো তখন রেখে যাওয়া যায় না। আমি সারেঙ্গকে বলে দিয়েছি জাহাজ এখানে নোঙ্গর করবে। দেখি কি ভাবে ওকে আনা যায়। তবে আমরা এখনও মোটেই নিরাপদ নই। জংলীরা ভীষণ হিংস্র, তারা এখানেও আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

হাঁ বাবা, সে কথা মিথ্যা নয়, ওরা চুপ করে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া তুমি লক্ষ করেছে কিনা জানি না সমুদ্র তীরের বালুকারাশির উপরে ছোট ছোট ছিপনৌকা দেখা যাচ্ছে। ঐ সব ছিপনৌকা এরা ব্যবহার করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফুল্লরা বললো–তোমরা কিছু ভেবো না, আমি যাবো এবং আমি নিয়ে আসবো ওকে সঙ্গে করে।

পারবে বোন আনতে? বলল লুসি।

ফুল্লরা আচলে অশ্রু মুছে বললো—-পারবো!

ওরা তোমাকে যদি হত্যা করে বসে?

মরতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই বোন, আমি যাবো। আমি ঐ বনে যাবো। বাবা, আমাকে তুমি তোমাদের স্পীডবোটে নামিয়ে দাও, আমি সেটাতেই যাবো। পারবো, আমি জাভেদকে ফিরিয়ে আনতে পারবো, যদি না পারি মরবো। তবুও আমার দুঃখ থাকবে না।

ক্যাপ্টেন আরফিন অনেক ভাবলেন কিন্তু কিভাবে জাভেদকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে সে উপায় খুঁজে পেলেন না। ফুল্লরার কথাটাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে

বাধ্য হলেন যদিও বিরাট একটা দুশ্চিন্তা ও আর ফিরে আসতে পারবে কিনা। জাভেদ সাগরবুকে লাফিয়ে পড়েও বেঁচে গেলে কি করে? তাও কোনো নদনদী নয়, সবচেয়ে বড় সাগর প্রশান্ত মহাসাগর। এর গভীরতা সীমাহীন। বৃহৎ সাগর, সব পর্বতমালা এই সাগরের তলদেশে লুক্কায়িত আছে। এ ছাড়া কত জলজীব- হাঙ্গর, কুমির, অক্টোপাস।

কিন্তু কিছুতেই ফুল্লরাকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। সে কেঁদে কেটে অস্থির হলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন পরামর্শ করলেন লুসি আর তার সহকারী নাবিকদের নিয়ে তিনি বললেন জাভেদ এখন সাগরতীরে নেই, সে জংলীদের সঙ্গে গহন বনে চলে গেছে। ওরা মনে করেছে জাহাজখানা এই স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। কিন্তু ওরা চলে গেলেও নিশ্চয়ই পাহারারত দু' এক জন আছে, যারা বড় বড় বৃক্ষশাখায় আত্মগোপন করে জাহাজের গতিবিধি লক্ষ করছে। এখন আমাদের জাহাজখানাকে আবার তীরের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

লুসি অবাক হয়ে তাকালো পিতার মুখের দিকে।

ক্যাপ্টেন হুই বুঝতে পারলেন লুসি তার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেছে, তাই তিনি কথাটা বুঝিয়ে বললেন-জাহাজখানা তীরের দিকে এগিয়ে নিলে আবার জংলীরা ফিরে আসবে সাগরতীরে এবং আমাদের জাহাজের ওপর আক্রমণ চালাবে। তখন নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে জাভেদও আসবে...

বাবা, তুমি যা বলছে ঠিক বুঝতে পেরেছি, জাভেদকে আবার সাগরতীরে ফিরিয়ে আনতে চাও?

হাঁ

কিন্তু তারা শুধু ফিরেই আসবে না, ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মারণাস্ত্র তীর আর বর্শা নিক্ষেপ করবে।

সে কথা অবশ্য সত্য। এজন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই কিভাবে আমরা জাভেদকে জাহাজে ফিরিয়ে আনতে পারি।

ফুল্লরা বলে উঠলো—আমি যাবো তার কাছে। তাকে ফিরিয়ে আনবো।

কিন্তু তার কাছে যাবি কি করে মা ফুল্লরা? অসংখ্য তীর আর বর্শা ছুটে আসবে। তোকে ওরা মেরে ফেলবে, হত্যা করবে তীরবিদ্ধ করে।

জাভেদ ঠিক আমাকে চিনতে পারবে! আমার বিশ্বাস সে আমাকে চিনতে পারবে। তুমি জাহাজখানাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো বাবা!

লুসি এতক্ষণ নিশ্চুপ ভাবছিলো।

এবার সে বললো–বাবা, আমাদের জাহাজখানাকে আর ফিরিয়ে তীরের দিকে নিতে হবে না। তুমি জাহাজ থেকে স্পীড বোট নামাতে বলল, আমি যাবো ফুল্লরার সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন হুই কিছু বলবার পূর্বেই ফুল্লরা বলে উঠলোনা না, আমি তোমাকে সঙ্গে নেবো না বোন। ওরা যদি তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে তা শুধু আমাকেই করবে, তোমাকে আমি মরতে দেবো না। তুমি আমাকে বিদায় দাও বোন।

লুসি বললো—তুমি স্পীডবোট চালাতে জানো না, কাজেই আমাকে যেতে হবে তোমার সঙ্গে।

তুমি স্পীডবোট চালাতে জানো বোন?

হাঁ, শুধু স্পীডবোট কেন, জাহাজ চালানোও শিক্ষা করেছি বাবার কাছে।

সত্যি?

হা বোন ফুল্লরা।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–তোমরা দুজনই আমার সন্তানের মত, কাজেই আমি ফুল্লরার সঙ্গে তোমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

ফুল্লরা কোনো কথা বললো না।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই স্পীডবোট নামানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর দড়ির সিঁড়ি নামানো হলো।

এবার ফুল্লরা সহ লুসি নেমে এলো স্পীড বোটে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন ছুই হাত নাড়তে লাগলেন।

লুসি আর ফুল্লরা স্পীডবোটে এসে বসেছে ততক্ষণে ওরাও হাত নাড়ছে।

লুসি স্পীডবোট চালিয়ে চললো।

ফুল্লরা পাশে বসে আছে।

স্পীডে ছুটে চললো স্পীডবোটখানা তীর অভিমুখে।

এদিকে জংলীদের মধ্যে সংবাদটা পৌঁছে গেলো। জংলীদের কয়েকজন তীরের কাছে গাছের ডালে আত্মগোপন করে জাহাজখানার প্রতি লক্ষ রেখেছিলো। তারা যখন দেখতে পেলো জাহাজ থেকে একটা বস্তু পানিতে নামানো হলো তখন তারা ছুটলো সর্দারকে সংবাদ দিতে।

জংলীসর্দার ও তার দল সবেমাত্র ফিরে গিয়ে বিশ্রামের জন্য বসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে জংলী প্রহরী এসে বললো—মাংহুরা বাওগা রাসাগো। রাসাগো, রাসাগো! মানে হলো, দুইজন মহিলা আবার আসছে। তোমরা এসো, তোমরা এসো……

পাশেই ছিলো জিং আর জাভেদ।

সর্দার দলবল নিয়ে ছুটলো, সবাই হাতেই তীর-ধনু আর বর্শা। তীরের ডগায় মারাত্মক বিষ মাখানো রয়েছে। জংলীরা এই বিষ শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে ব্যবহার করে। যখন ওরা বন্যপশু খাদ্যের জন্য শিকার করে তখন তারা বিষাক্ত তীরফলা ব্যবহার করে না। শিকারের অস্ত্র ওদের ভিন্ন আর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র ভিন্ন। এ সব অস্ত্রে মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে। এসব অস্ত্র দেহে স্পর্শ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে তাতে কোনো ভুল নেই…..মানুষ বা যত বৃহৎ জীবজন্তুই হোক না কেন, এ বিষ সহ্য করার ক্ষমতা কারও নেই।

জংলীরা দলবল নিয়ে পুনরায় সাগরতীরের দিকে ছুটলো। সর্দারপুত্র জিং আর জাভেদও তীর-ধনু হাতে ছুটছে। জংলীরা চায় না তাদের রাজ্যে আর কেউ পদক্ষেপ করুক। ভয়ংকর জীবজন্তুর চেয়েও এরা হিংস্র। দয়ামায়া বলতে এদের কিছু নেই। তবে কেউ কোনো উপকার করলে কৃতজ্ঞতা বোধ আছে।

জাভেদকে তাই ওরা মেনে নিয়েছে সাদা চামড়া দেখেও।

সাগরতীরে এসে জংলী সর্দার দাঁড়িয়ে পড়লো, আর তার চারপাশে অসংখ্য জংলী তীর ধনু আর বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সকলের দৃষ্টি সাগরবক্ষে। দু'জন তরুণী স্পীডবোটে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিকটবর্তী হতেই তীরধনু উদ্যত করে ধরলো সবাই।

সর্দারের নির্দেশের অপেক্ষায় বারবার তাকাচ্ছে ওরা সর্দারের দিকে।

জিং আর জাভেদ সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে।

জিংও তার তীর-ধনু সাগরবক্ষে স্পীডবোটখানার দিকে উঁচু করে ধরেছে। লক্ষ্যের মধ্যে এসে পড়লেই তারা সবাই তীরবিদ্ধ করে দুটি তরুণীর দেহ ঝাঁঝরা করে দেবো।

জাভেদ সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো–মাতা কাউসা গোমারু। মানে হলো-বাবা তীর-ধনু নামিয়ে ফেলতে বলো!

সর্দার জংলীদের ইংগিত করলো নামিয়ে নিতে তাদের তীরধনুগুলো।

প্রথমে জিং তীরধনুসহ হাত দু'খানা নত করে নিলো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলিগণ সবাই নিজ নিজ হাত দু'খানাকে তীর-ধনুসহ নামিয়ে নিলো এবং সকলেই তাকালো জাভেদের মুখের দিকে। ওরা অবাক হয়ে গেছে, হঠাৎ সর্দারকে কুশোকা তীর-বর্শা ছাড়তে বারণ করলো কেন? জাভেদকে সর্দার ও তার দলবল কুশোকা বলতো। কুশোকা মানে হলো বিদেশী।

ততক্ষণে তরুণীদ্বয়সহ স্পীডবোটখানা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। জাভেদের কথায় ওরা কেউ ওদের আক্রমণ করলো না। অদ্ভুত সুন্দর দুটি তরুণী! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে জংলীদল, তারা তাকাচ্ছে একবার জাভেদ আর একবার তরুণীদ্বয়ের দিকে।

কাছাকাছি এসে পড়েছে স্পীড বোটখানা।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জাভেদ তরুণীদ্বয়কে।

একজন অপরিচিতা, অপরজন ফুল্লরা।

জাভেদের মুখোভাবে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। ফুল্লরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো স্পীডবোট থেকে-জাভেদ, জাভেদ, তুমি বেঁচে আছে জাভেদ......

স্পীড বোটখানা তীরে এসে ভিড়েছে।

লুসি স্পীড বোটের সম্মুখ অংশে বসে হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে। ফুল্লরা ভুলে গেলো জংলীদের ভীষণ আর ভয়ংকর স্বভাবের কথা। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে জাভেদের বুকে-জাভেদ, আমার জাভেদ, তুমি বেঁচে আছো...

জাভেদ নির্বাক-নিশ্চুপ।

ফুল্লরা বললো—আর তোমাকে ছেড়ে দেবো না। চলো আমার সঙ্গে চলো...... ফুল্লরা। জাভেদের হাত ধরে টানতে লাগলো।

জিং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সে ফুল্লরার দিকে তীর-ধনু উদ্যত করে ধরে বললো–মানুং রুকানো বাং......মানে আমি ওকে এই মুহূর্তে হত্যা করবো।

জাভেদ কিছু বলবার পূর্বে জংলী সর্দার তার পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললো–মালো মা নুনা টারোনা কো? মানে ও তোমার বন্ধুকে চেনো, তাকে তুমি হত্যা করবে?

জিং অবাক হয়ে তাকালো জাভেদের মুখের দিকে। হাতখানা তার তীর-ধনুসহ নেমে এলো।

জাভেদ মাথা দোলালো।

জিং বললো–কুশোকা মাথু তুরাস্তা মানে বিদেশী বন্ধু তুমি ওকে চেনো?

জাভেদ বললো—ফুলাগো! মানে হাঁ আমি ওকে চিনি।

সর্দার বললো–কুশোকা মাথু ফাংহু রো গা! মানে বিদেশী তুমি কি ওর সঙ্গে যাবে?

বললো জাভেদ–নামতা লোগা ফাংহা মাথুলাং। মানে, বাবা তুমি যদি বলো তবে আমি যাবো ওর সঙ্গে।

সর্দার বললো–হুয়া কো মাংগুনা ফাংহা। মানে, তুমি যেতে চাইলে আমরা তোমাকে ধরে রাখবো না।

জিং বলে উঠলো নামতা মাংগুনা ফাংহা! মানে, বাবা ও যেতে চাইলেই যেতে দেওয়া যায় না।

সর্দার বললো—জিংরু ললাংকামা সামতুং। মানে, তুমি ইচ্ছা করলেই ওকে ধরে রাখতে পারো না।

জাভেদকে তখন জোর করে ফুল্লরা টেনে নিয়ে চললো তাদের স্পীডবোটের দিকে।

জাভেদের হাতে তীর-ধনু, পিঠে বাঁধা তূণ।

জংলী সর্দার সবাইকে চুপ থাকার জন্য হাতের ইশারা করলো।

জিং চিৎকার করে বললো–কুশোকা নোতা! কুশোকা নোতা! কুশোকা নোতা.....মানে, বিদেশী বন্ধু যেও না, বিদেশী বন্ধু যেও না......

ওর বাবা সর্দার বলে উঠলো–চুকানো জিং, চুকানো জিং......মানে, জিং যেতে দাও, যেতে দাও জিং......

জাভেদকে কিছু ভাববার সময় না দিয়েই ফুল্লরা তাকে টেনে স্পীডবোটে তুলে নিলো এবং লুসিকে স্পীডবোট ছাড়তে বললো।

লুসি প্রস্তুত ছিলো, ফুল্লরা আর জাভেদ স্পীডবোটে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্পীডবোটে ষ্টার্ট দিলো। অত্যন্ত স্পীডে চালালো লুসি স্পীড বোটখানা।

জাভেদ হাত নাড়তে লাগলো।

জংলী সর্দারও হাত নাড়াতে লাগলো তীরে দাঁড়িয়ে।

সর্দারকে হাত নাড়তে দেখে অন্যান্য জংলীও হাত নাড়তে লাগলো।

জিং শুধু হাত নাড়লো না, সে গম্ভীর হয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো ছল ছল করছে। সত্যিই জিং ওকে ভালবেসেছিলো অত্যন্ত গভীরভাবে। জাভেদ শুধু তার

জীবনরক্ষাকারীই ছিলো না, তার পরম বন্ধু ছিলো। হিংস্র স্বভাব জঙলীসন্তান জিং-এর মনকে জাভেদ জয় করতে পেরেছিলো, কারণ জাভেদের স্বভাবও কিছুটা হিংস্র জীবজন্তুর মতই। তাছাড়া ভয় কাকে বলে জানে না জাভেদ, এসব কারণেই জংলীরা তার সাদা চামড়া হলেও তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলো সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে।

জাভেদকে পাওয়ার পর হতে জিং নতুন এক জীবন লাভ করেছিলো। খুব ভাল লাগতো ওকে। তাছাড়া সেদিন ও যদি সাপটাকে হত্যা না করতো তাহলে এতদিনে তার দেহটা সর্পরাজের পেটে হজম হয়ে যেতো।

জিং একবার তাকিয়ে দেখে নিলো সাগরবক্ষে ভাসমান স্পীডবোটখানাকে। জাভেদ, ফুল্লরা আর লুসিকে অস্পষ্ট লাগলো তার চোখে।

জংলী সর্দার জিং-এর কাঁধে হাত রেখে বললো—ঘাতুরা সাদুগো জিং মাঙ্গুলু কোষা! মানে, দুঃখ করোনা জিং, কাউকে কেউ ধরে রাখতে পারে না।

এবার সর্দারের নির্দেশ পেয়ে জংলীদল ফিরে চললো। যেতে যেতে বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তারা সাগরবক্ষে দ্রুত এগিয়ে চলা স্পীড বোটের দিকে।

*

জাভেদ জংলীদের মধ্য হতে ফিরে এলো বটে কিন্তু সে সর্বক্ষণ বিষণ্ণ এবং ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো। একা একা নির্জন ডেকে বসে সাগরবক্ষে তাকিয়ে থাকে। কিভাবে সে কাউকে বলে না, কেউ জানে না তার মনের কথা।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বলেছেন, ওকে আপন মনে থাকতে দাও। ওর সঙ্গে তোমরা অহেতুক কথা বলো না। আবার যেন সে সাগরে লাফিয়ে না পড়ে। ওর জীবনের মায়া অত্যন্ত কম। কি করে সাগরবক্ষ থেকে উদ্ধার পেলো এবং ঐ অজানা অচেনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলো সে কথা সবার অজানা রয়ে গেলো।

মাথুন দ্বীপের অতি নিকটে এসে পড়েছে জাহাজ এলুন। নাবিক এবং মাঝিমাল্লাদের মুখে একটা ভীতিভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবার মনেই একটি সন্দেহের দোলা না জানি কোন মুহূর্তে সেই ভয়ংকর জীবটা আক্রমণ চালিয়ে তাদের জাহাজখানাকে ধ্বংস করে দেবে। প্রাণের মায়া কার না আছে!

শুধু ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের মুখমন্ডলে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ পরিলক্ষিত হয় না, তিনি নির্ভীক সৈনিকের মত কঠিন।

লুসি বলে–বাবা, তোমার বন্ধুর মত যদি আমাদের অবস্থা হয় তখন কেমন হবে?

ছিঃ মা, অমন কথা ভাবতে নেই। আমার জাহাজে অনেক মারাত্নক আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, কোনো বিপদ এলে আমার সহকারীরা নিশ্চুপ থাকবে না।

তা তো বুঝলাম কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ডুবন্ত পর্বতমালার গহ্বরে,

ওসব কথা মনে করো না মা লুসি! সব সময় ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখবে। তিনি আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। যাও মা লুসি, ফুল্লরা আর জাভেদ ওরা নিজেদের ক্যাবিনে আছে। যাও ওদের সঙ্গে গল্প করে গিয়ে।

লুসি পিতার মনোভাব বুঝতে পারলো, তিনি এসব কথা নিয়ে বেশি সময় এখন নষ্ট করতে চান না। আজকাল সর্বক্ষণ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। লুসি জানে তার পিতা মাথুন দ্বীপের বিষয়েই সর্বদা ভাবেন। কাজেই লুসি বেশি কথা আর বাড়ায় না। সে এগিয়ে গেলো ফুল্লরার ক্যাবিনে কিন্তু সেখানে তাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছিলো এমন সময় তার কাছে এলো ফুল্লরার কণ্ঠস্বর।

রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে দু'হাত রেখে সম্মুখে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে জাভেদ। পাশে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে ফুল্লরা। সে বলছে-জাভেদ, তুমি সবার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। তুমি কি জানো না আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তুমি। তোমাকে ছেড়ে আমি আমার অস্তিত্ব আছে জানি না। তুমি এত নিষ্ঠুর, আমাকে একা ছেড়ে যেতে তোমার এতটুকু বাধলো না......ফুল্লরার কণ্ঠস্বর চাপাকান্নায় ভরে উঠলো। ফুল্লরা হাত রাখলো জাভেদের হাতের ওপর।

জাভেদ হাত সরিয়ে নিয়ে তাকালো ফুল্লরার মুখের দিকে।

ফুল্লরা জাভেদের বুকে মাথা রাখলো। আবেগভরা গলায় বললো–জাভেদ, তুমি আমাকে ফেলে আর কোথাও যেতে পারবে না। অনেক সাধনা করে তোমাকে পেয়েছি। জাভেদ, কথা বলো না কেন?

জাভেদ তাকিয়ে তবুও নীরব।

লুসি এসে দাঁড়ায় সেখানে, বলে সে–বাবা পাঠালেন তোমাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর জন্য। আমার সঙ্গে তোমরা ডেকে গিয়ে বসবে কি?

ফুল্লরা জাভেদের কাছ হতে কিছুটা সরে দাঁড়ালো। জাভেদ তাকিয়ে আছে লুসির দিকে।

ফুল্লরা বললো—-চলো লুসি, আমরা ডেকে বসি। ওকে আমরা ডাকবো না। ও আমাদের সঙ্গ চায় না। বড় হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও।

না না, তুমি ওকে ভুল বুঝেছো। জাভেদ এসো, এসো আমরা তিনজন মিলে ডেকে বসে গল্প করি?

লুসি জাভেদের হাত ধরে আবার বললো—-চলো।

জাভেদ অগ্রসর হলো লুসি আর ফুল্লরার দিকে।

তিনজন এসে বসলো ডেকের ধারে আসনে।

লুসিই প্রথম কথা বললো—দেখো জাভেদ, ফুল্লরা তোমাকে কত ভালবাসে। তোমার ওপর ওর অনেক বিশ্বাস অথচ তুমি ওকে অবহেলা করো।

জাভেদ লুসির কথায় কোনো উত্তর দিলো না, একটু হাসলো মাত্র।

ঠিক এ মুহূর্তে একজন নাবিক চিৎকার করে উঠলোক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, আমাদের জাহাজখানার তলদেশে কোনো বস্তুর স্পর্শ অনুভব হচ্ছে।

কথাটা কানে যেতেই লুসি উঠে দাঁড়ালো।

অপর একজন নাবিক ছুটে গেলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের ক্যাবিনের দিকে।

লুসি বুঝতে পারলো বিপদ দেখা দিয়েছে।

পিতার মুখে পিতার বন্ধুর ডায়রী থেকে পাঠ করা কথাগুলো মুহূর্তের জন্য তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তবে কি সেই ভয়ংকর জীবটা তাদের জাহাজখানাকে আক্রমণ করে বসলো।

ফুল্লরার মুখমন্ডলও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

নাবিকদের ছুটাছুটি এবং সাউন্ড বক্সে বিপদসংকেত ধ্বনি জাহাজ এলুনের সবাইকে ভয়বিহ্বল করে তুললো। ধীরে ধীরে জাহাজখানার গতি মন্থর হয়ে এলো। জাহাজের তলদেশে কিছু যেন আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

ছুটে এলো লুসি পিতার পাশে।

পিতার মুখেও একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, দীর্ঘকাল গত হয়েছে, এতদিনের হয়তো বা সেই ভয়ংকর জীবটার সলিল সমাধি হয়ে থাকবে, অথবা অন্য কোনো স্থানে চলে গিয়ে থাকবে। যদিও তিনি প্রস্তুতি নিয়েই মাথুন দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তবুও যেন আশ্বস্ত ছিলেন, হয়তো সেই ভয়ংকর জীবটার আক্রমণ হবে না।

এখন তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

জাভেদ আর ফুল্লরাও এসে দাঁড়ায় সেখানে।

ফুল্লরা সব শুনেছিলো ক্যাপ্টেন আরফিনের বন্ধুর ডায়রীর কাহিনী। বললো সে জাভেদকে লক্ষ্য করে জানো জাভেদ, আমাদের জাহাজখানাকে ভয়ংকর একটি জীব আক্রমণ করেছে। পানির তলায় বাস করে সে জীবটা।

জাভেদ শুনলো ফুল্লরার কথাগুলো, বললো সেজীব!

হাঁ, ভয়ংকর বিরাট আকার একটি জীব। প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় ডুবন্ত একটি পর্বতমালার গহ্বরে বাস করে সেই জীবটা। ঐ জীবটা আমাদের জাহাজের তলদেশে মাথা তুলেছে বলে মনে হয়।

এত বড় জীব?

তুমি সব জানো না জাভেদ। ক্যাপ্টেন বাবার মুখে যদি সব শুনতে! বললো ফুল্লরা।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই কিন্তু লক্ষ করছিলেন জাভেদকে। ফুল্লরা যখন তাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলো তখন জাভেদের মুখোভাব স্বাভাবিক মনে

হচ্ছিলো।

এগিয়ে এলেন আরফিন হুই, তিনি সংক্ষেপে দ্রুত ঘটনাটা বললেন, আরও বললেন– মাথুন দ্বীপে আমাকে যেতেই হবে। হয় মৃত্যুবরণ করবো নয় জয়ী হবো।

জাভেদ কিছু ভাবলো, তারপর সে ক্ষিপ্রগতিতে তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেলো।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো সবাই অবাক হলো।

ফুল্লরা আর লুসি একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো।

জাভেদ এভাবে চলে যাওয়ায় হতবাক হয়ে পড়লো ফুল্লরা।

কিন্তু পরক্ষণেই সবাই দেখলো জাভেদ তার তীর-ধনু নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দাঁড়ালো সে ক্যাপ্টেন হুইয়ের পাশে, গম্ভীর গলায় বললো—কোথায় তোমার সেই ভয়ংকর জীবটা? আমি তাকে খতম করবো।

না না, তুমি ওকে হত্যা করতে যেও না জাভেদ। সে অত্যন্ত বিরাট ভয়ংকর জীব। জাভেদ অট্টহাসি হেসে বললো–হাঃ হাঃ হাঃ, জানো না ফুল্লরা এই তীরে যে বিষ মাখানো আছে তা কত ভয়ংকর।

ফুল্লরা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, একটা অভূতপূর্ব আনন্দ তার গোটা মনকে তৃপ্ত করে। তুললো। কতদিন জাভেদকে ফুল্লরা এমন করে হাসতে দেখেনি। সত্যি সে আবার যদি পূ মত স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। অনেকদিন জংলীদের মধ্যে বাস করে কাঁচা মাংস খেয়ে স্বভাবটা তার হিংস্র হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার সময় কোথায়।

নাবিকদের ছুটাছুটি আর ক্যাপ্টেন আরফিনের চিৎকার সমস্ত জাহাজখানাকে প্রকম্পিত করে তুলেছে। ক্যাপ্টেন আরফিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন নাবিকদের।

নাবিকগণ ভারী আগ্নেয় অস্ত্রগুলো প্রস্তুত করে নিচ্ছে। জাহাজের চারপাশে ঠিকমত জায়গায় বসিয়ে নিচ্ছে তারা ক্যাপ্টেনের আদেশমত। জীবটা দেখামাত্র

তারা যেন এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

সবাই যখন ব্যস্ত তখন জাহাজখানা একদিকে প্রায় কাৎ হয়ে গেছে। জাভেদ গভীরভাবে লক্ষ করছিলো সাগরবক্ষে প্রচন্ড ঢেউগুলোর দিকে।

ফুল্লরা বুঝতে পারে জাভেদ সাগরবক্ষে কিছু দেখতে চেষ্টা করছে! ওর ভয় হলো আবার সে সাগরের বুকে লাফিয়ে পড়বে না তো? ফুল্লরা অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে জাভেদকে ধরে ফেললো এবং বললো–না, তোমাকে আমি আবার সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবো না জাভেদ। তুমি রেলিংয়ের কিনারা থেকে সরে এসো। সরে এসো...

জাভেদ ফুল্লরার দিকে খেয়াল করেছে বলে মনে হলো না, সে ওকে সরিয়ে দিলো। পানির গভীর তলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে কিছু লক্ষ করছে।

লুসি কিন্তু অবাক হয়ে দেখছে। জাভেদকে লুসি যেন আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো। ওর সুন্দর চেহারা, বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, দীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ খুব ভাল লাগলো ওর কাছে।

ফুল্লরা সরে দাঁড়ালো।

লুসি কিন্তু এখনও জাভেদের দিকে তাকিয়ে। এমন একটা ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হলেও লুসি জাভেদের কার্যকলাপ লক্ষ করছে।

এমন সময় ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের কণ্ঠস্বর সাউন্ড বক্সে শোনা গেলো। তিনি জাহাজের চালককে নির্দেশ দিচ্ছেন জাহাজের স্পীড বাড়িয়ে দেবার জন্য।

পরক্ষণেই জাহাজখানা কিছুটা একপাশে কাৎ হয়ে চলতে শুরু করলো। যদিও জাহাজখানার উল্টে যাবার ভয় আছে তবুও ক্যাপ্টেনের নির্দেশ, তাই জাহাজের গতি বাড়িয়ে দেয়া হলো। জাহাজখানা কিছুটা অগ্রসর হয়েই আবার প্রচন্ড ধাক্কা খেলো এবং উল্টে যাবার মত অবস্থা হলো।

সাউন্ড বক্সে ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের গলা শোনা গেলো–জাহাজ থামিয়ে ফেলো। উল্টে যাবার আশংকা আছে। নিচে জীবটা ঠেলে ধরেছে। জাহাজ আর নড়বে না! তোমরা সাবধান হয়ে যাও, জাহাজ উল্টে যেতে পারে।

নাবিকগণের সবার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

জাভেদ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো অকস্মাৎ।

চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ফুল্লরা-জাভেদ, জাভেদ একি করলে তুমি!

লুসি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

ফুল্লরার আর্তচীৎকার গোটা জাহাজটাকে কম্পিত করে তুললো।

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রচন্ড ঢেউ আজ শান্ত ছিলো।

জাভেদ তীর-ধনু হাতেই পানিতে লাফিয়ে পড়েছে এবং সে ভালভাবে জাহাজের তলদেশে তাকিয়ে দেখছে। দক্ষ সাঁতারু জাভেদ ঘাবড়ে যায় না। সে জাহাজের তলদেশে একটি বৃহদাকার কিছু দেখতে পায় এবং চেষ্টা করে তীরটাকে ধনুতে সংযোজন করতে। কিন্তু পানির মধ্যে সাগরবক্ষে স্থির থাকা কারও সাধ্য নয়, জাভেদ তবুও পানির মধ্যে বিষাক্ত তীর ছোঁড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হলো তার প্রচেষ্টা।

ওদিকে জাহাজখানা হঠাৎ সোজা হয়ে যায়।

সবাই জাভেদের দিকে লক্ষ করছিলো।

ফুল্লরা আর লুসি ভীষণ এক উদ্বিগ্নতা আর উত্তেজনা নিয়ে ঝুঁকে আছে রেলিংয়ের ধারে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই লাইফবয় নামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাবিকগণ লাইফবয় নামানো শুরু করে দিলো। জাহাজখানা চলতে শুরু করলো।

ফুল্লরা চিৎকার করে ডাকতে লাগলোজাভেদ, জাভেদ, ফিরে এসো জাভেদ! আমার জাভেদ..

কিন্তু জাভেদ তখন ঢেউগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডুবন্ত জীবটার সন্ধান করে চলেছে। একবার তলিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে, আবার তলিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। আশ্চর্য, জাহাজখানা স্বাভাবিকভাবে সাগরবক্ষে ভেসে উঠেছে ঠিক পূর্বের মত।

জাহাজে সবার মুখমন্ডল কিছুটা প্রসন্ন হলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন বললেন—এ যাত্রা রক্ষা পেলাম বলে মনে হচ্ছে! সারেঙ্গকে নির্দেশ দিলেন জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিতে।

ফুল্লরা ছুটে এসে আরফিন হুইয়ের হাত জড়িয়ে ধরলোবাবা, তুমি জাহাজ থামিয়ে ফেলার নির্দেশ দাও। বাবা, তুমি জাহাজ থামিয়ে ফেলার নির্দেশ দাও……বাবা…..ক্যাপ্টেন বাবা, ওকে সাগরে ফেলে তুমি যেও না। আর নইলে তুমি আমাকে সাগরে ফেলে দাও বাবা……

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই যেন নির্বাক হয়ে পড়েছেন। ভয়ংকর জীবটার কবল হতে রক্ষা পেতে হলে তাদের জাহাজখানা দ্রুতগতিতে ঐ স্থান হতে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। তাদের ভাগ্য ভাল তাই জীবটা জাহাজখানা উল্টে দেয়নি, বরং সরে গেছে জাহাজের তলদেশ হতে। জাভেদ এখন সাগরবক্ষে, সেই ভয়ংকর জীবটার সঙ্গে যুদ্ধে রত। এখন কি করা তার কর্তব্য ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না। কি করবেন, জাহাজখানা থামিয়ে ফেলে জাভেদকে উঠিয়ে নেবেন, না জাহাজখানাকে রক্ষা করার জন্য দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করবেন।

লুসি ফুল্লরার সঙ্গে ছুটে এসেছিলো পিতার পাশে।

চিৎকার করে বললো লুসিবাবা, তুমি এলুনকে থামতে বললো। বাবা, তুমি জাভেদকে উঠিয়ে নাও……ওকে এভাবে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না……

আরফিন হুই বললেন–এত বড় সাগরে জাভেদকে উদ্ধার করা কি সম্ভব মা! দেখছোনা ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। জাহাজখানা অনেক দূরে চলে এসেছে।

বাবা, তুমি ভালভাবে লক্ষ করে দেখো জাভেদ এখনও ভেসে আছে। সে তার সম্মুখের লাইফবয়টা ধরবার চেষ্টা করছে……

আরফিন দুই কন্যার কথায় বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে তাকালেন পেছনে ছেড়ে আসা সাগরবক্ষে, দেখা যাচ্ছে বটে, প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো যদিও মাঝে মাঝে আড়াল করে ফেলছিলো তবুও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাভেদকে, জাভেদের হাতের কাছাকাছি রয়েছে লাইফবয়।

জাহাজখানা অনেক দূরে এসে পড়েছে।

সবার দৃষ্টি জাহাজের পেছন দিকে।

সকলেই জাহাজের পেছন অংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুল্লরা আর লুসি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল্লরার গড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। আঁচলে চোখ মুছছে সে বার বার।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইও বাইনোকুলার হাতে জাহাজের পেছনের দিকে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছেন, তার অন্তরের উদ্বিগ্নতার ছাপ মুখমন্ডলে ফুটে উঠেছে। প্রশস্ত ললাটে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো দড়ির মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জাহাজখানা সম্পূর্ণ থেমে পড়লো। অবশ্য ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের নির্দেশেই জাহাজ এলন দাঁড়িয়ে পড়লো এবং বিপদসংকেতধ্বনি বাঁশি বাজতে শুরু করলো।

শুধু ক্যাপ্টেন আরফিনের মুখমন্ডলেই চিন্তার ছাপ বিদ্যমান নেই, জাহাজের সবাই ভীষণভাবে চিন্তিত, না জানি তাদের ভাগ্য কি আছে! এমন সময় দেখা গেলো জাভেদের অনতিদূরে একটি প্রকান্ড জীব মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খাচ্ছে তার দেহের সঙ্গে। সমস্ত দেহটা লোমে ভরা, মাথাটা একটি মস্তবড় জালার মত।

চিৎকার করে দুহাতে চোখ ঢাকলো ফুল্লরা।

লুসি এবং অন্যান্য সবাই ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। একটু পূর্বে জাহাজখানার তলদেশে ঐ জীবটা মাথা তুলেছিলো, এ কারণেই জাহাজখানা উল্টে যাবার উপক্রম হয়েছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

একজন নাবিক বলে উঠলো–ক্যাপ্টেন, ওকে লক্ষ্য করে আমরা কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করবো কি?

ক্যাপ্টেন হুই বললেন–না না, গোলাগুলিতে জীবটা নিহত নাও হতে পারে। এতে জাভেদের ক্ষতি হবে.....

বলুন ক্যাপ্টেন কি করবো আমরা? বললো একজন নাবিক।

আর একজন বললো–জীবটা আমাদের জাহাজখানাকে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে ক্যাপ্টেন?

হাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এ মুহূর্তে তোমাদের গোলাগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ আমাদের জাহাজ এখন বেশ দূরে অবস্থান করছে। গোলা নিক্ষেপ করলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। সে সাগরে ডুব দিয়ে আমাদের জাহাজখানাকে চুরমার করে তলিয়ে দেবে। তা ছাড়া গোলাগুলি বিদ্ধ হবে জাভেদের দেহে......

ফুল্লরা কান্নাজড়িত গলায় বললো–না না, গোলাগুলি ছুঁড়তে দিওনা বাবা। ও তাহলে মারা পড়বে......কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো ওর।

এমন সময় দেখা গেলো জীবটা জাভেদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভীষণভাবে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে কি জীবটা জাভেদকে দেখতে পেয়েছে।

মনে হচ্ছে, একটি পর্বত যেন এগুচ্ছে জাভেদের দিকে।

সাগরের প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো তার দেহের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। বরং ঢেউগুলো তার শরীরে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে দেহের চারপাশে।

ততক্ষণে জাভেদ এক ফাঁকে লাইফবয় আঁকড়ে ধরে ফেলেছে, এখন সে ঢেউয়ের ওপরে ভেসে সাঁতার কাটছে। এখনও তার হাতের মুঠায় তীর-ধনুক পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ক্যাপ্টেন আরফিন। তিনি বলছেন–জাভেদ জীবটাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রচন্ড ঢেউগুলো তার লক্ষ্য স্থির হতে দিচ্ছে না।

সবাই উদ্বিগ্নতা নিয়ে তাকিয়ে আছে সেইদিকে।

জাভেদ আর সাগরতলের অদ্ভুত জীবটার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। জীবটা সাগরের ঢেউ এড়িয়ে জাভেদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে আর জাভেদ তার লাইফবয় নিয়ে তার কেটে দূরে সরে যাচ্ছে। লাইফবয়সহ কখনও ঢেউয়ের মাথায় আবার কখনও ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলোতে দূরে হলেও সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন এবং অন্যান্য সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ করছে এই দৃশ্য। শুধু আশ্চর্যজনক নয়, একেবারে ভয়ংকর ভয়াবহ ঘটনা। সাগরতলে যে বহু ধরনের জীব বাস করে একথা সবাই জানে কিন্তু এমন ধরনের জীব কারও নজরে পড়েছে কিনা সন্দেহ। বিশালদেহী জীবটার আকার কিছুটা গরিলার মত। জমকালো এবং লোমশ দেহ। মাথাটা ড্রাম বা জালার মত মস্ত বড়। গভীর জলরাশির মধ্যে সে যেন সচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

লুসি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–বাবা জীবটা কি সাগরতলে পা স্পর্শ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে না সাঁতার কেটে এগুচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন কন্যার প্রশ্নের জবাবে বললেন-ওর বাসস্থানের কাছাকাছিই ও এখন রয়েছে। ওর পায়ের তলায় সেই ভুবন্ত পর্বতমালা আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

হাঁ বাবা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। নইলে সাগরতলে পা রেখে হেঁটে বেড়ানো অসম্ভব। দেখো, দেখো বাবা জীবটা এবার কিন্তু সাঁতার কাটছে……

ডুবন্ত পর্বতমালার ওপরে যতক্ষণ পা ছিলো ততক্ষণ সে হাঁটছিলো। এবার নিশ্চয়ই তার পায়ের নিচে পর্বতমালার অংশ নেই এবং একারণেই সে সাঁতার কেটে এগুচ্ছে।

বাবা, তুমি ঠিক বলেছো। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে কোন জীবের পা স্পর্শ করবে এমন জীব কি পৃথিবীতে আছে?

অসম্ভব কোথায়, এ মুহূর্তে যে জীবটা আমাদের জাহাজখানাকে উল্টে দেবার উপক্রম করেছিলো, সে জীবটা কম নয়। একটা জাহাজ তার কাছে খেলনার মত। একটা মানুষ তার কাছে পিপীলিকার চেয়ে বড় নয়, তাহলে মনে করো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির অসাধ্যও কিছু নেই।

একজন নাবিক বলে উঠলো—পর্বতমালা ছোটখাটো নয়। বৃহৎ পর্বতমালা সাগরতলে ডুবে আছে। তারপরও বহু জলরাশি রয়েছে। নইলে সেই পর্বতমালার উপরিভাগ দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে না অথচ জীবটা তার উপরে দিব্যি দাঁড়িয়ে…..

হাঁ, সে কথা সত্য। পর্বতমালার উপরেও রয়েছে গভীর জলরাশি। তবুও যদি জীবটা ডুবন্ত পর্বতের উপরে পা রেখে সাগরের উপরে দাঁড়ালে তার দেহের অর্ধেক ভাগ দেখা যায় তাহলে মনে করো তার উচ্চতা কত হতে পারে।

কিন্তু এ সময় ওসব নিয়ে বেশীক্ষণ ভাববার সময় নেই, সবার দৃষ্টি জাভেদ আর ভয়ংকর জীবটার সঙ্গে জাভেদের তুমুল লড়াই চলছে।

গভীর সাগরের বুকে একজন মানুষ আর একটি ভয়ংকর জলজীবের যুদ্ধ, বড় ভয়াবহ ব্যাপার। এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফুল্লরা ডেকের উপর বসে পড়েছে, তাকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। তবুও লুসি বার বার ওর পিঠে হাত রেখে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তার দৃষ্টি সাগরবক্ষে জাভেদ আর জীবটার দিকে। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ যদিও মাঝে মাঝে জাভেদকে দৃষ্টির আড়ালে ঢেলে ফেলছিলো তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দেখবার জন্য।

কিছু দূরে জীবটা এসে পড়েছে।

এবার জাভেদ তার লাইফবয়টার উপর বুক রেখে ধনুতে তীর সংযোজন করলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন সব দেখতে পাচ্ছেন। বাইনোকুলারে সবকিছু ধরা পড়ছে তার চোখে। আরও দু'একজন নাবিক চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে। জাভেদ যদি ঐ মুহূর্তে সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবটাকে আক্রমণ করার চেষ্টা না করতো তাহলে জীবটা জাহাজখানাকে অব্যাহতি দিতো না। ভেঙে চুরে একাকার করে ফেললো, মৃত্যু ঘটতে সবার। যেমন অন্য জাহাজগুলো পরিত্রাণ পায়নি। এই পথে যে জাহাজ এসেছে সে জাহাজ আর ফিরে যেতে পারেনি। তাই ভুলক্রমেও এ পথে কোনো জাহাজ আসতো না।

আজ ক্যাপ্টেন আরফিন এ পথের যাত্রী হয়েছেন শুধু তার নাবিক বন্ধুর অনুরোধে। মাথুন দ্বীপ তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাই তিনি প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলেছেন মাথুন দ্বীপের দিকে। তিনি জানতেন যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে তবুও তিনি পিছপা হননি, দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন হুই জীবনে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তাই

তিনি ভয় পান না কোনো বিপদকে। আজও তিনি মোটেই ঘাবড়ে যাননি, বিপদকে জয় করাই হলো মানুষের কাজ।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো লুসি–বাবা দেখেছো ওর সমস্ত দেহটাই পানির উপরে জেগে উঠেছে। কি বড় আর ভয়ংকর জীবটা। ওর এতোবড় দেহটা সাগরের তলদেশে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলো......।

কিন্তু কেউ লুসির কথায় কান দিলো না, সবাই স্তব্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে।

জাভেদকে ধরবার জন্য সাঁতার কেটে জীবটা এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। এই তো কয়েক গজ দূরে মাত্র, তাহলেই ধরে ফেলে আর কি! হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়েছে জীবটা জাভেদের দিকে।

সাগরের পানি আর লাইফবয় সাহায্য করছিলো জাভেদকে। জাভেদ এবার মরিয়া হয়ে তীর ছুড়লো জীবটাকে লক্ষ্য করে কিন্তু প্রচন্ড ঢেউয়ের উপরে লাইফবয় ভেসে উঠলো কয়েক গজ উপরের দিকে। লক্ষ ব্যর্থ হলো আবার।

জাভেদ কয়েকটা বিষাক্ত তীর কোমরের বেল্টের সঙ্গে খুঁজে নিয়েছিলো। তারই একটি করে খুলে নিয়ে ধনুতে সংযোজন করছিলো এবং জীবটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছিলো। যতই দক্ষ হোক না কেন, গভীর সাগরবক্ষে লক্ষ ঠিক রাখা বড় মুস্কিল।

জাহাজের সকলেই জাভেদের আশা ছেড়ে দিলো এক রকম। কারণ জীবটার সঙ্গে একটা মানুষের পেরে ওঠা অসম্ভব। ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের দু'চোখে বিস্ময় এবং উদ্বিগ্নতা, এ মুহূর্তে তার ভাবনা ছিন্নভিন্নভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কেউ কিছু বললে তার কানে তা প্রবেশ করছিলো না। তার চোখে সব সময় বাইনোকুলার রয়েছে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন হুই আনন্দধ্বনি করে উঠলেন–লেগেছে লেগেছে! দুধর্ষ জাভেদ জয়ী হয়েছে......জাভেদ জয়ী হয়েছে.......

লুসি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পিতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলে জাভেদ জয়ী হয়েছে! বাবা, জীবটার বুকে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হওয়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। জীবটা ছটফট করছে। জাভেদ, সাবাস্ জাভেদ......ফুল্লরা তোমার জাভেদ বেঁচে

গেছে! জীবটা এবার মরবে……ঐ দেখো, দেখো……কি ভয়ংকরভাবে সাগরের পানি তোলপাড় করে জীবটা ছটফট করছে…..

ফুল্লরা হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে তাকালো যেদিকে জাভেদ আর সাগরতলের সেই ভয়ংকর জীবটা লড়াই হচ্ছিলো। তাকিয়ে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলো–বোন লুসি, সত্যি জীবটার বুকে তীর বিদ্ধ হয়েছে তো?

হাঁ, হাঁ, মা আমি বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখেছি জাভেদ লাইফবয়টার উপরে বুক রেখে তীর ছুঁড়ে মেরেছিলো জীবটাকে লক্ষ্য করে। জীবটা ঠিক ঐ মুহূর্তে পানির মধ্যে বেশ উঁচু হয়ে জাভেদের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু জাভেদের তীর বাড়িয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু জাভেদের তীর তার পূর্বমুহূর্তেই জীবটার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো। একটু থেমে বললেন ক্যাপ্টেন হুই-তীরটা তার বুকে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাগরের পানিতে কাৎ হয়ে পড়লো জীবটা, তারপর শুরু হলো তোলপাড়। ঐ দেখো মা, কিভাবে সাগরের পানি তোলপাড় করছে।

সকলের দৃষ্টি সাগরের বুকে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই তাকিয়ে আছে।

জীবটার বিশাল দেহ একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। যেন একটা পর্বত সাগরজলে ডুবছে আর উঠছে। সেকি প্রচন্ড তোলপাড়। সাগরের বুকে প্রচন্ড ঢেউগুলো আরও প্রচন্ড হয়ে উঠেছে। জাভেদের লাইফবয় একবার তলিয়ে যাচ্ছে আবার প্রচন্ড ঢেউয়ের উপরে ভেসে উঠছে। জাভেদ তার লাইফবয়খানাকে ধরে রেখেছে শক্ত করে, নইলে কোথায় তলিয়ে যেতে তার কোনো হদিস মিলতো না। জাহাজখানা হতে বেশ দূরে ছিলো জাভেদ আর জলজীবটা তবুও জীবটার দেহের প্রচন্ড আস্ফালনের আঘাতে সাগরের ঢেউগুলো জাহাজের তলদেশে আঘাত হানছিলো ভীষণভাবে। জাহাজ এলুন দোলনার মত দুলছিলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন মুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে বাইনোকুলার খানা সরিয়ে দেননি। তিনি এবং অন্যান্য সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিলেন এই ভয়াবহ ঘটনাটা। বহুকাল ধরে যে জীবটা প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ডুবন্ত পর্বতমালার গহ্বরে বাস করে শত শত জাহাজ এবং জাহাজের যাত্রীদের ধ্বংস করে দিয়েছে, ডুবিয়ে মেরেছে সবাইকে, সেই ভয়ংকর জীবটাকে আজ হত্যা

করতে সক্ষম হলো জাভেদ! ক্যাপ্টেন হুইয়ের দু'চোখে বিস্ময় ও আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে। কেমন করে তিনি জাভেদকে সাগরবক্ষ হতে রক্ষা করবেন এটাই ভাবছেন ক্যাপ্টেন হুই। জীবটার দেহ নীরব হয়ে এসেছে, সাগরের পানি আর তোলপাড় হচ্ছে না। পূর্বের মত ঢেউগুলো শুধু আছড়ে পড়ছে জীবটার অর্ধডুবন্ত দেহটার গায়ে।

এলুনের নাবিকগণ সবাই উল্লাসভরা কণ্ঠে আনন্দধ্বনি করে উঠলো। জাভেদের দুর্বার সাহসেই যে আজ জাহাজ এলুন রক্ষা পেলো তা নিঃসন্দেহ।

জীবটা সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়েছে।

তার প্রাণহীন দেহটা ভেসে চলেছে অর্ধডুবন্ত অবস্থায়। লুসি ছুটে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এলো এবং প্রাণহীন জীবটার ভাসমান অবস্থার ছবি তুলতে লাগলো।

তরুণ নাবিক ডিরোমা এগিয়ে এসে বললোমিস লুসি, আমি কিন্তু বহু পূর্ব হতেই ছবি। নিচ্ছিলাম। জাভেদ আর জলজীবটার মধ্যে যখন প্রচন্ড লড়াই চলছিলো তখন আমি পাওয়ারফুল লেন্স দিয়ে ছবি সংগ্রহ করছিলাম......

ধন্যবাদ ডিরোমা, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ছবিগুলো আমাকে দেখাবে।

নিশ্চয়ই! বললো ডিরোমা।

লুসি তখন পুনরায় তার ক্যামেরা নিয়ে ভাসমান ভয়ংকর জীবটার ছবি নিতে শুরু করলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হই তখন স্পীডবোট নামাতে ব্যস্ত।

নাবিকদের সাহায্যে কয়েকখানা স্পীডবোট সাগরে নামিয়ে ফেলা হলো। জাভেদকে উদ্ধার করাই এখন ক্যাপ্টেন আরফিনের প্রধান কাজ এবং কর্তব্য। এই মুহূর্তে তার যা আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। ফুল্লরাকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, তারপর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন এলুনের পাশে স্পীডবোটে।

দু'জন নাবিককে ক্যাপ্টেন হুই নিজ স্পীডবোটে সঙ্গে নিলেন। আর অন্যান্য স্পীডবোটে রইলো অন্য কয়েকজন নাবিক, সবাই এগিয়ে চললো জাভেদের

উদ্ধার কাজে।

লুসি চুপ থাকার মেয়ে নয়, সেও একটা স্পীডবোটে অন্যান্য নাবিকের সঙ্গে চেপে বসলো। নিজে সে স্পীডবোট চালনা করে চললো।

সাগরের প্রকান্ড ঢেউ এড়িয়ে দ্রুত এগুচ্ছে তারা।

জাহাজের পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছে সেই ভয়ংকর জীবটার মৃতদেহ। লুসি এবং ক্যাপ্টেন আরফিন হুই নিজ নিজ স্পীডবোট থেকে এই বিস্ময়কর জীবটার শেষ পরিণতি লক্ষ করতে লাগলো।

*

জাভেদসহ ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন হুই এলুনে।

ফুল্লরা ঝাঁপিয়ে পড়লো জাভেদের বুকে, বাষ্পরুদ্ধ গলায় ডাকলো জাভেদ! আমার জাভেদ..

জাভেদের হাতে তখনও সেই ধনুটি রয়েছে।

তীরগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিলো। বাকি কিছু তীর জাহাজ এলুনের ক্যাবিনে রয়েছে।

লুসিও জাভেদের করমর্দন করে বললো–তুমি বীর পুরুষ! তোমাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই নাও আমার হাতের হীরার আংটিটা, এটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমি তোমাকে দিলাম।

লুসি নিজের হাত হতে হীরার আংটিটা খুলে জাভেদের হাতে পরিয়ে দিলো।

জাভেদ আংগুলটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখলো কোনো কথা সে বললো না।

ক্যাপ্টেন আরফিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে আছেন জাভেদের মুখের দিকে। কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবেন সে ভাষা তিনি যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। জাভেদ যদি এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে না থাকতো তাহলে তাদের মৃত্যু ছিলো অনিবার্য। সেই ভয়ংকর রাক্ষস জলজীবটার কবল থেকে রক্ষা ছিলো না জাহাজ এলুনের।

আজ বার বার স্মরণ হচ্ছে বন্ধু নাৰিকটির কথা, যার ডায়রী তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছিলো। তখন লুসি ছিলো শিশু, তাই তিনি নিজের ইচ্ছাকে দমন করে রেখেছিলেন। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই। লুসি যখন বুঝতে শিখেছে, যখন সে পিতার কথা রাখতে শিখেছে, সাহসী হয়ে উঠেছে, তখন ক্যাপ্টেন হুই বন্ধুর ডায়রীখানা বের করে নিয়েছিলেন হাতে। তার সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আগ্রহী হলেন, সব কথা তিনি জানালেন কন্যা লুসির কাছে। ক্যাপ্টেন হুই মনে করেছিলেন, এতদিন সেই ভয়ংকর জীবটার মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু তার সে চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও জীবটা তেমনি জীবিত ছিলো এবং আরও কত জাহাজ ও জাহাজের যাত্রীদের জীবন্ত সমাধি ঘটিয়েছে কে জানে!

লুসি পিতাকে কিছু চিন্তামগ্ন দেখে বললো–বাবা, তুমি কি ভাবছো? তোমার দেওয়া স্নেহের দান আমি দুধর্ষ জাভেদকে তার অসীম সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দিলাম।

আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি মা লুসি। তুমি জাভেদকে যে সম্মান দেখালে তা আমিও পারিনি। সত্য জাভেদ শুধু দুর্ধর্ষ জাভেদই নয়, সে একজন বীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কথাগুলো বলে ক্যাপ্টেন আরফিন হুই জাভেদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—জাভেদ, তুমি আমার সন্তানের চেয়েও অনেক বেশি।

ফুল্লরা জাভেদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলো। জাভেদের বিজয় তাকে গর্বিত করে তুলেছিলো। জাভেদ তার শিশুকালের সাথী—-একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে, বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, তীর-ধনু নিয়ে বন্য পশুপাখী শিকার করেছে। পাহাড়ের উপরে উঠেছে, আবার পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছে। নদীতে সাঁতার কেটে দূরে অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। জাভেদকে ফুল্লরা ভালবাসে, নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় সে তার কাছে। কিন্তু জাভেদ অন্যমনস্ক, সে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত থাকে, কারও কথা ভাবার যেন সময় নেই ওর।

ফুল্লরা বহুদিন অভিমান করে দূরে সরে গেছে, হয়তো বা বেশ কিছুদিন কথাই বলেনি। হয়তো বা সম্মুখে আসেনি ওর। আড়াল থেকে লক্ষ করেছে ফুল্লরা, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়নি। ফুল্লরার অভিমান, ফুল্লরার ব্যথা-বেদনা জাভেদকে একটুও বিচলিত করেনি। তাই নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেছে ফুল্লরা।

ওকে নিয়ে অনেক ভেবেছে সে, জাভেদ কি তার মনের কথা কিছু বোঝে না বোঝে না তার প্রেম ভালবাসা? কতদিন ফুল্লরা বন থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে পেছন থেকে পরিয়ে দিয়েছে ওর গলায়। কই, জাভেদ তত তার প্রতিদানে একটি কথাও বলেনি। হয়তো বা একটু হেসেছে মাত্র।

ফুল্লরা যখন এসব ভাবছিলো লুসি তখন জাভেদকে নিয়ে তার বাবার সঙ্গে জাভেদের প্রশংসায় আত্নহারা। লুসির দু'চোখে আনন্দ উচ্ছ্বাস, জাভেদ যেন তার মনকেও জয় করে। নিয়েছে। বললো সে বাবাকে লক্ষ্য করে-বাবা, তুমি ওকে কিছু উপহার দেবে না।

দেবো মা, দেবো। জাভেদ আমাদের যে উপকার করেছে তার কোনো প্রতিদান হয় না। শুধু আমিই নই, সমস্ত দেশবাসী তার কাছে কৃতজ্ঞ। তার দুর্দান্ত সাহসের জন্যই, তার বীরত্বের জন্যই আজ আমরা পৃথিবীর বুকে বেঁচে রয়েছি। সময় এলে আমি তাকে আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাই দেবো।

সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ মা!

বলবে না তোমার সেই প্রিয় জিনিসটি কি?

আজ নয় বলবো পরে! যাও মা লুসি, জাভেদকে নিয়ে তোমরা তার ক্যাবিনে যাও। আমি জাহাজ ছাড়বার জন্য নির্দেশ দিয়ে আসি। তারপর আপন মনে বললেন—ও ছিলো বলেই না আবার যাত্রা শুরু করতে পারছি।

জাভেদকে সঙ্গে নিয়ে লুসি ও ফুল্লরা চলে গেলো জাভেদের ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে লুসি জাভেদের হাত থেকে তীর-ধনুটা নিয়ে রাখলো একটা টেবিলে, হেসে বললো–জাভেদ, তোমার সাহসকে আমি অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

হাসলো জাভেদ।

ফুল্লরা বললো—তুমি কিছু বলো?

কি বলবো শিখিয়ে দাও? বললো জাভেদ।

জাভেদকে এই প্রথম যেন কথা বলতে শুনলো লুসি। বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত সে কণ্ঠস্বর। অত্যন্ত ভাল লাগলে লুসির কাছে।

ফুল্লরা মৃদু হেসে বললো—কি বলতে হয় তুমি আজও শিখলে না। তোমাকে নিয়ে আমি আর পারি না। আজও তুমি সেই আগের তুমিই রয়ে গেছো। কেউ যদি বলে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তাহলে বলতে হয়–ধন্যবাদ।

বললো জাভেদ—ধন্যবাদ।

শুধু ধন্যবাদ নয়, মিস লুসি ধন্যবাদ।

মিস লুসি ধন্যবাদ! হেসে বললো জাভেদ।

লুসির মুখে তৃপ্তির হাসি। সে অনেক পুরুষকে দেখেছে কিন্তু কেউ তার হৃদয় জয় করতে পারেনি। সবাইকে সে একজন মানুষ হিসেবে দেখেছে, কর্মময় এই পৃথিবীর মানুষগুলো যেন এক একটি যান্ত্রিক পুতুল। সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কারও তাকাবার সময় নেই কারও দিকে। ছুটছে শুধু ছুটছে সকলে, ব্যস্ততার মধ্যেই যেন ওদের জীবন। সবার সঙ্গে তার পিতাকেও দেখেছে লুসি ব্যস্ত মানুষ হিসেবে। এত কাজ–শুধু কাজ সমস্ত দুনিয়াটাই যেন যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। লুসি হাঁপিয়ে উঠতো, এত ব্যস্ততা ওর ভাল লাগতো না। ইচ্ছা করতো কোনো শান্ত দেশে গিয়ে বাস করবে। যেখানে থাকবে না এত কর্ম কোলাহল আর ব্যস্ততা। তার বাবা আর সে শুধু কর্ম করবে। শুধু বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেবে, আর ভাববে শুধু ভাববে অনেক কিছু। লুসি জাভেদের মধ্যে খুঁজে পায় একটি নতুন মানুষকে।

জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন বলেছেন–আর দুদিনের মধ্যেই তারা মাথুন দ্বীপে পৌঁছে যাবে। তার গোটা অন্তরে খুশির উৎস। যে জীবকে তার এত ভয় ছিলো সে জীবটার মৃত্যু ঘটেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে তলিয়ে গেছে তার প্রাণহীন দেহটা। ভাবলে তিনি আশ্চর্য হন এত বড় ভীষণ আকার জীবটাকে কি ভাবে জাভেদ হত্যা করতে সক্ষম হলো। তীরগুলো কি এতই বিষাক্ত ছিলো, যার বিষ সহ্য করবার ক্ষমতা হলো না ঐ বিশাল ভয়ংকর জীবটারও। একদিন ক্যাপ্টেন হুই জাভেদের ক্যাবিনে প্রবেশ করে তীরগুলো দেখছিলেন। কোন শক্ত গাছের

সরু ডাল দিয়ে তৈরি তীরগুলো। ফলকগুলো বিষাক্ত সাপের দাঁতে তৈরি। সেই সাপের দাঁতের পরখগুলোর মধ্যে ভরা রয়েছে মরাত্নক বিষ। দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি যেন এই তীরফলকগুলো, সুন্দর এবং তীক্ষ্ণ ধারালো। তার মধ্যে সরু ছিদ্রপথে বিষ ভরানো রয়েছে। মনোযোগ সহকারে দেখলেন ক্যাপ্টেন হুই। সেদিন মাত্র কয়েকটা তীর নিয়ে জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সাগরে। এখনও বেশ কিছু তীর রয়ে গেছে তূণের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বিস্ময় নিয়ে দেখছেন ঠিক সেই মুহূর্তে জাভেদ, লুসি আর ফুল্লরা প্রবেশ করে সেই ক্যাবিনে। ক্যাপ্টেন আরফিন তীরগুলো হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে জাভেদ ভীষণভাবে চমকে যায় এবং তাড়াতাড়ি তীরসহ হাত ধরে ফেলে।

বললো জাভেদ–এগুলো বড় বিষাক্ত! এর ওপর হাত স্পর্শ করলেই মৃত্যু ঘটবে!

হেসে বললেন ক্যাপ্টেন আরফিন-দেখেছি এই সামান্য তীর দ্বারা তুমি কি করে এত বড় বিশাল কার জীবটাকে হত্যা করলে?

এই তীরফলকগুলো লডিজ নামে এক ধরনের সাপের দাঁত দিয়ে তৈরি। লডিজ অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ। বললো জাভেদ।

আরফিন হুই বললেন—লডিজ সাপের দাঁত এত সরু আর লম্বা?

হাঁ, এ সাপ অত্যন্ত আশ্চর্য ধরনের। এ সাপ কোথাও দেখা যায় না ঐ দ্বীপেই শুধু আছে এ সাপ। জাভেদ কথাগুলো বলে ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের হাত থেকে তীরগুলো নিয়ে রেখে দিলো যথাস্থানে।

লুসি বললো—-জাভেদ, সাপগুলো কি তুমি দেখেছো?

হাঁ দেখেছি।

কেমন দেখতে?

সাধারণ সাপের মত, তবে চোয়ালের দুপাশে দুটি লম্বা সরু ধারালো দাঁত আছে, যার মধ্যে আছে সরু ছিদ্রপথ।

আরফিন হুই বললেন—তীরফলকে যে ছিদ্র রয়েছে তা পূর্ব হতেই ছিলো?

বললো জাভেদ— হাঁ, ঐ দাঁতগুলো শুধু কেটে নেওয়া হয় তারপর সেগুলো দিয়ে তীর তৈরি করা হয়। তীর তৈরির সময় কোনো বিষ ভরা হয় না।

সত্যি আশ্চর্য বটে! বললেন, আরফিন হুই।

জাভেদ তূণের মধ্যে তীরগুলো গুছিয়ে রাখছিলো।

ফুল্লরা নিশ্চুপ, জাভেদ আজ সুন্দর করে কথা বললো। তার সমস্ত মন ভরে উঠেছে আনন্দে। কারণ জাভেদকে ফুল্লরা কোনোদিনই বেশি কথা বলতে শোনেনি। আজ সে যেন অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছে একসঙ্গে।

*

জাভেদকে ঘিরে লুসি কল্পনার জাল বোনে। বই হাতে নিয়ে পড়ায় মন বসে না, ভেসে ওঠে বইয়ের পাতায় জাভেদের মুখ। ওর কথা বলার ভঙ্গী, ওর হাসি, ওর চাহনি সব যেন ভালবাসে লুসির কাছে। সময় পেলেই লুসি জাভেদের ক্যাবিনে যায়, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে।

সেদিন দুপুর বেলা যে যার কাজে মগ্ন।

জাহাজ একটানা ঝকঝক্ শব্দ করে এগিয়ে চলেছে।

আকাশ আর সাগর ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আকাশে হাল্কা মেঘের আনাগোনা চলেছে।

ক্যাবিনে বসে লুসি তাকিয়ে ছিলো বাইরে আকাশের দিকে।

হাল্কা মেঘের দল রাজহংসীর মত এদিক থেকে সেদিকে ভেসে চলেছে। সর্যের আলোতে মেঘগুলো মাঝে মাঝে সোনালী লাগছিলো। এ সময় লুসি আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে ক্যাবিনের বাইরে। এগিয়ে যায় সে জাভেদের ক্যাবিনের দিকে।

ক্যাবিনের দরজা অর্ধেক খোলা অবস্থায় ভেজানো রয়েছে।

লুসি দরজায় মৃদু টোকা দেয়।

জাভেদ বলে-কে?

লুসির কণ্ঠস্বর–আসতে পারি?

বলে জাভেদ-এসো।

লুসি ক্যাবিনে প্রবেশ করে জাভেদের শয্যায় তার পাশে গিয়ে বসে, বলে-কেমন আছে জাভেদ

একটু হেসে বললো জাভেদ—ভাল।

কেমন লাগছে তোমার জাহাজে

অনেক ভাল।

জাভেদ, তোমার সম্বন্ধে আমার মনে অনেক প্রশ্ন। তোমাকে আমি যতই দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি।

কেন?

তুমি অন্যান্যের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

জাভেদ ভাল করে তাকালো লুসির মুখের দিকে, কি বলতে চায় সে।

লুসি বলে চলেছে–তোমার অদ্ভুত তেজোদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা, তোমার অসীম শক্তি আর দুর্বার সাহস শুধু মানুষকে হতবাকই করে না, একেবারে বিস্মিত করে। জাভেদ, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে বড় ভাল লাগে, তাই মাঝে মাঝে চলে আসি, বিরক্ত হওনা তো?

জাভেদ কোনো জবাব দেয় না, শুধু তাকিয়ে থাকে।

লুসি আবার বললো–জাভেদ বললে না?

কি বলবো?

তুমি বিরক্ত হও কিনা?

জানি না।

জাভেদ, তুমি আশ্চর্য ধরনের কথা বললে? আমি যখন তোমার ক্যাবিনে আসি তখন তুমি বিরক্ত হও না খুশি হও বলো? তোমার উত্তরের উপর নির্ভর করবে আমার অনেক কিছু। বলল, বলল জাভেদ জাভেদের কাঁধে হাত রাখে লুসি।

এমন সময় ফুল্লরা প্রবেশ করে ক্যাবিনে।

জাভেদের কাঁধে হাত রেখে লুসিকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে ফুল্লরার মুখ কালো হয়ে ওঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখোভাব প্রসন্ন করে নিয়ে বলে-লুসি, তুমি এখানে আর আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফুল্লরা ক্যাবিনে প্রবেশ করলেও লুসির মুখমন্ডলে কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো না। সে যেমনভাবে জাভেদের কাঁধে হাত রেখে বসেছিলো তেমনি বসেই বলে-এসো ফুল্লরা! তোমাকে ছাড়া গল্প জমছে না।

ফুল্লরা এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

লুসি সরে এলো ফুল্লরার দিকে-কই, বললে না তো কেন আমাকে খুঁজছিলে?

একা একা ভাল লাগছিলো না তাই।

বেশ হলো, এবার তিনজন মিলে গল্প করে সময় কাটানো যাবে।

ফুল্লরা বললো—জানি না আর কতদিন এমনিভাবে জাহাজের মধ্যে কাটাতে হবে। বড় হাঁপিয়ে পড়েছি লুসি।

আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে, কারণ তোমাকে আর জাভেদকে পেয়ে আমার নতুন জীবন শুরু হয়েছে। নইলে শুধু জাহাজ, সাগর আর আকাশ–এ ছাড়া কেউ আমার সঙ্গী ছিলো না। বাবাকে সব সময় কাছে পেতাম না। শুধু একমাত্র কাছে পেতাম আমার বই গুলোকে। এখন তোমরা আমার নিঃসঙ্গ সময়গুলোকে ভরিয়ে তুলেছে।

ফুল্লরা বললো—কিন্তু আমরা মাটির মানুষ, মাটির স্পর্শ পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। জানি না কবে এই জাহাজ আর সাগর থেকে পরিত্রাণ পাবো।

বুঝতে পারছি তোমার ভাল লাগছে না সাগর আর আকাশ।

হা বোন।

ফুল্লরা, তোমরা চলে গেলে আমি কেমন করে থাকবো বলো? মাটিতে পা রাখলে খুব আনন্দ হয় তা জানি তবুও তোমাদের বিদায় দিতে কষ্ট হবে আমার এবং আমার বাবার। ঠিক আছে, সময় হলে ওসব নিয়ে ভাবা যাবে। এখন অহেতুক মনঃকষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি বলল? একটি অদ্ভুত গল্প শোনাবো জাভেদ আর তোমাকে। কেমন রাজি?

ফুল্লরা বললো–বাজি!

লক্ষ্মী মেয়ে তুমি! কি বলল জাভেদ, সত্যি বলছিনা?

জাভেদ কোনো জবাব দিলো না।

লুসি বললো—দেখলে ফুল্লরা, জাভেদ কেমন চুপচাপ। তুমি এই ক্যাবিনে প্রবেশের পূর্বে আমি ওকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু না, কোনো জবাবই দিলো না ও।

ফুল্লরা বললো–কই, তুমি না বললে গল্প শোনাবে?

শোনাবো, তবে তোমাকেও একটি গল্প শোনাতে হবে, যেমন আমি আমার বাবাকে যখন গল্প শোনাই তখন তার কাছে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি তিনি আমাকে গল্প শোনাবেন কিনা।

ফুল্লরা বললো—আমি আবার গল্প জানি নাকি?

জানো না?

না।

তোমার জীবনের কোনো ঘটনা নেই?

আমার জীবনের ঘটনা ভাল লাগবে তোমার?

হাঁ, খুব লাগবে। বলল লুসি।

আগে তুমি যে গল্প শোনাতে চেয়েছিলে তা শোনাও।

কই, জাভেদ তো কিছু বলছে না?

ফুল্লরা বললো—ওর কথা ভেবোনা। যত বেশি ওকে নিয়ে ভাববে তাতে শুধু তোমার ভাবনাই বাড়বে। তুমি বলো?

লুসি জাভেদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

ফুল্লরা তাকালো ওদের দুজনের মুখের দিকে, ফুল্লরা কিছু অনুধাবন করতে চেষ্টা করে।

লুসি গল্প বলতে শুরু করে যাবার সঙ্গে জাবুবুরী চলেছি। আমাদের জাহাজের নাম ছিলো ফুংহা। সাতদিন সাতরাত আমদের ফুংহায় অতিবাহিত করতে হবে। মাঝে রুবা বন্দর। আমাদের জাহাজখানা রুবায় কয়েক ঘন্টা নোঙ্গর করবে বলে জানালেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলাম আমরা সবাই। তখন আমার বয়স মোল হবে। একটানা এত ঘন্টা জাহাজে কাটানো বেশ কষ্ট হচ্ছিলো আমার। বাবা যদিও নিজের কাছে কাছে আমাকে রাখছিলেন এবং যত্নও নিচ্ছিলেন তবুও আমার বড় খারাপ লাগছিলো।

থামলো লুসি।

ফুল্লরা জাভেদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো তার দৃষ্টি কোন্ দিকে। লুসির গল্প শুনছে কিনা। এতক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকার লোক নয় জাভেদ। তবুও চুপ করে বসে আছে। যদিও গল্প শোনা তার অভ্যাস নেই কোনোদিনই।

জাভেদ তাকিয়ে ছিলো বাইরের দিকে ক্যাবিনের উক্ত গবাক্ষে।

ঠান্ডা বাতাসে তার চুলগুলো এলোমেলোভাবে ললাটে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। একাগ্রচিত্তে তাকিয়েছিলো সে সাগরের উচ্ছল তরঙ্গরাশির দিকে।

ফুল্লরা বললো–বলো বোন লুসি!

লুসি বলে চললো–একদিন আমরা রুবা বন্দরে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের সে কি ভীষণ আনন্দ লাগছে। জাহাজ নোঙ্গর করার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লাম আমরা। বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন। ভারী সুন্দর লাগলো রুবা বন্দর। আমরা বন্দর ত্যাগ করে রুবা শহর অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথের দু'পাশে সারি সারি নাম না জানা গাছ। এক একটা গাছ বিরাট দৈত্যরাজের মত দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। আমাদের গাড়ীখানা এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের সম্মুখে একটি জনতার দল দেখলাম। তারা কয়েকজন লোককে হাত-পা বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। তাদের দেহে বেত্রাঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি বাবাকে বললাম, ওদের হাত-পা বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন এবং ওদের এভাবে বেত্রাঘাত কেন করা হচ্ছে? বাবা জবাব দিলেন, ওরা শ্রমিক। মালিক ওদের কাজে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ওভাবে শ্রমিকদের শাস্তি দিচ্ছেন।

কি নির্মম! বললো ফুল্লরা।

লুসির চোখ দুটো জ্বলছিলো, বললো—আমার ধমনির রক্তে আগুন ধরে গেলো। মনে হচ্ছিলো মালিকগুলোকে পেলে ওদের চামড়া; ছিঁড়ে নোনা পানি লাগিয়ে দিতাম।

আমাদের গাড়ি এগুতে লাগলো।

আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করতেই দেখলাম, এক জায়গায় বেশ কিছু লোক সমবেত হয়ে কয়েকজন লোককে বেদম প্রহার করছে। যাদের শরীরে প্রহার করা হচ্ছে তারা সবাই প্রৌঢ়, পঞ্চাশের নিচে বয়স নয়।

কেন? কেন প্রহার করছে প্রৌঢ় ব্যক্তিদের বললো ফুল্লরা।

বাবাকে আবারও জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন–যাদের প্রহার করা হচ্ছে তারা শ্রমিক নেতা। এ দেশের ধনবান ব্যক্তিরা গরীবদের ওপর এভাবেই নির্যাতন চালিয়ে যায়।

বলেছিলাম, এর কি কোনো প্রতিকার নেই।

বাবা বলেছিলেন, গরীবের প্রতি ধনীদের অবিচার চিরদিন চলে আসছে, চলবেই। প্রতিকার করবেন যারা তারাই যে অত্যাচারী আর অন্যায়কারী। সত্যি সেদিন আমার বড় খারাপ লেগেছিলো। গল্প হলেও সত্য, এসব আমার নিজের চোখে দেখা। ফুল্লরা মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই সেদিনের কথা। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যগুলো।

ফুল্লরা বললো—বোন, তোমরা সভ্য সমাজের মানুষ, তাই এসব তোমাদের চোখে ধরা পড়ে! আমরা বনজঙ্গলে বাস করি, জীবজন্তু আর জনজঙ্গল আমাদের সাথী, তাই এসব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

সত্যি তোমরা সুখী এদিক দিয়ে। বললো লুসি।

এমন সময় ক্যাপ্টেন আরফিনের গলা শোনা গেলো সাউন্ড বক্সে……আমরা মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি……মাথুনের বৃক্ষরাজি আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে…..তোমরা ডেকে এসে দাঁড়াতে পারো……

লুসির কানে কথাটা পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। ফুল্লরা আর জাভেদের দুজনের দু'খানা হাত দু'হাতে ধরে বললো–এসো, এসো আর বিলম্ব করা যায় না।

জাভেদ আর ফুল্লরাকে এক রকম টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলো লুসি জাহাজের ডেকে, ফুল্লরা আর জাভেদকে লক্ষ্য করে বললো সে–দেখো, দেখো ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটা মাথুন দ্বীপ……

জাভেদ আর ফুল্লরা তাকিয়ে দেখলো, দূরে কালো ভাসমান কোনো বস্তুর মত একটি বৃহদাকার কিছু দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য নাবিকও এসে দাঁড়িয়েছে ডেকে, তারাও আগ্রহ নিয়ে দেখছে। সবার চোখেমুখেই খুশির উচ্ছ্বাস।

ক্যাপ্টেন আরফিনের গলা শোনা যাচ্ছে, তিনি বলছেন-নাবিকগণ, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা আজই মাটিতে পা রাখবে এবং সে মাটি আমাদের আকাক্ষিত মাটি……মাথুনের মাটি……আমার বহু দিনের আশা-আকাক্ষা মাথুনের মাটি……

লুসি তো পিতার গলার স্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলোমাথুন, আমার বাবার আকাঙ্ক্ষিত মাথুন……তুমি সত্যিই তাহলে দেখা দিলে……

জাভেদের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলো লুসি দু’হাতে-জাভেদ, এ বিজয়ের জন্য তুমিই ধন্যবাদের অধিকারী......জাভেদ কথা বলো? কথা বলে জাভেদ? ঐ দেখো আমার বাবার চির আকাঙ্ক্ষিত মাথুন দ্বীপ......

লুসি যখন জাভেদের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে উচ্ছল আনন্দে কথাগুলো বলছিলো তখন ফুল্লরার মুখমন্ডলে একটা অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির আভাস ফুটে উঠলো। ফুল্লরা চায় না তার জাভেদকে কেউ স্পর্শ করে। জাভেদ শুধু তারই থাকবে।

জাভেদ কোনো জবাব দিলো না।

লুসি জাভেদের গলা মুক্ত করে দিয়ে ঝুঁকে পড়লো রেলিংয়ের ধারে—সত্যি আমার ইচ্ছা হচ্ছে সাগরে সাঁতার কেটে মাথুন দ্বীপে চলে যাই। জাভেদ, তোমার মত যদি আমিও সাঁতার কাটতে পারতাম......

ফুল্লরা অভিমান করে চলে যায় নিজের ক্যাবিনে। এক মুহূর্ত তার ইচ্ছা হয় না জাহাজে থাকার। লুসি কি তাহলে জাভেদকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়? না না তা হবে না, জাভেদ শুধু তার, তারই থাকবে। কিন্তু এ জাহাজ ত্যাগ করে যতদিন না চলে যাবে ততদিন স্বস্তি নেই, আশ্বস্ত হতে পারবে না সে। লুসি একদিন বলেছিলো জীবনে সে কাউকে ভালবাসেনি একমাত্র তার বাবা ছাড়া। তাহলে কি লুসি জাভেদকে তার নিজের করে নিতে চায়? কারণে অকারণে সর্বক্ষণ লুসি জাভেদের ক্যাবিনে প্রবেশ করে। জাভেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চায়, সব সময় ওকে সে ঘিরে রাখতে চায়। অসম্ভব, ফুল্লরা সব হারাতে পারে কিন্তু জাভেদকে সে হারাতে পারে না।

ফিরে তাকিয়ে লুসি দেখলো ফুল্লরা নেই, ডাকলো লুসি উচ্চকণ্ঠে–ফুল্লরা, ফুল্লরা। কোথায় তুমি......ফুল্লরা......লুসি ছুটে গেলো তার ক্যাবিনে। ক্যাবিনে প্রবেশ করে লুসি দেখতে পেলো ফুল্লরা তার বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে আছে।

লুসি তার পাশে গিয়ে বসে বললো—-চলে এলে কেন ফুল্লরা?

ফুল্লরা লুসির কথায় কোনো উত্তর দিলো না!

ভেবে পাচ্ছে না লুসি কি হলো হঠাৎ করে ফুল্লরার। অমন করে চলেই বা এলো কেন। লুসি ও তার বাবার আনন্দে আনন্দিত হওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু কেন ফুল্লরা এমন করে চলে এলো। বললো লুসি–তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো ফুল্লরা?

এবার কথা বললো ফুল্লরা-না, আমি ভাল আছি।

তবে চলে এলে কেন অমন করে?

ভাল লাগছিলো না।

লুসি ফুল্লরার ললাটে হাত রেখে বললোশরীর খারাপ লাগছে বুঝি? চলো বাবাকে গিয়ে বলি। জানো ফুল্লরা, বাবা খুব ভাল ডাক্তারী জানেন যদিও তিনি ডাক্তার নন।

আমার জন্য তোমাদের কাউকে ভাবতে হবে না।

কেন

জানি না।

ফুল্লরা, তোমার কথাগুলো আজ বড় হেয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে। আজ বড়ই খুশির দিন, কারণ বাবার সাধনা ও লক্ষ্য মাথুন দ্বীপ আজ আমাদের সম্মুখে। এই সাফল্যের জন্য ধন্যবাদের পাত্র জাভেদ। শুধু তাই নয়, সে আমাদের জীবনরক্ষাকারী বলা যায়। সত্যি জাভেদ অদ্ভুত অপূর্ব, যার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। জানো ফুল্লরা, ওকে আমার খুব ভাল লাগে। ওর হাসি, ওর কথা, ওর চাহনি আমার মনকে অভিভূত করে দিয়েছে।

ফুল্লরার দু'চোখে বিস্ময়, সে স্তব্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে লুসির মুখের দিকে।

হেসে বলে লুসি–কি দেখছো ফুল্লরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

ফুল্লরা মাথা নিচু করে নিলো।

লুসি বলে চলেছে ফুল্লরা, শুধু আমি নই, আমার বাবাও ওকে খুব ভালবাসে। দেখলেনাবাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন।

বললো ফুল্লরা–যাও লুসি, আমার ভাল লাগছে না কোনো কথা শুনতে।

সত্যি তোমার অসুখ করেছে, নইলে অমন করে কোনো দিন তো কথা বলোনা ফুল্লরা! বেশ, আমি যাচ্ছি, বাবাকে পাঠাবো তোমার কাছে। কারণ অসুখ বিসুখ

আমার চেয়ে তিনিই ভাল বোঝেন। জাভেদ একা আছে, যাই ওর কাছে......

কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো লুসি।

ফুল্লরা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। লুসি কি তার মনের কথা কিছু বুঝতে পারে না। অদ্ভুত এ মেয়েটি, কেন সে কি জানে না জাভেদ ফুল্লরার! ওকে ছাড়া ফুল্লরা বাঁচতে পারবে না, এটা কি লুসি বুঝতে পারে না! নাকি সে ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না। জাভেদ যখন সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিখোঁজ হয়েছিলো তখন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলো ফুল্লরা। সব সময় বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো, লুসি কত দিন তাকে সান্তনা দিয়েছে। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বাবার মুখে শোনা কত বিস্ময়কর গল্প বলে শুনিয়েছে। তবুও কি লুসি অনুভব করেনি! তারপর যখন জাভেদ বিষবাণ নিয়ে সাগরে জলজীবটার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন কত কান্নাকাটি করেছে ফুল্লরা, তাও কি লুসির স্মরণ নেই?

অনেক কিছু ভাবছে ফুল্লরা, এমন সময় ক্যাপ্টেন আরফিন এলেন তার ক্যাবিনে, ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন-মা ফুল, তুমি নাকি অসুস্থ! কি হয়েছে মা তোমার পাশে বসলেন তিনি ফুল্লরার।

ফুল্লরা তেমনি শুয়ে আছে।

একটি কথাও সে বললো না।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তার কথায় তা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি ফুল্লরার পিঠে হাত রেখে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন—অসুস্থ বোধ করছো? বলো আমি তোমাদের বুড়ো ছেলে। ছিঃ আমার কাছে লুকোতে নেই? বলো মা কি হয়েছে তোমার?

ক্যাপ্টেন হুইয়ের সরল-সহজ কথায় ফুল্লরার মন প্রসন্ন হলো। বললো ফুল্লরানা বাবা, আমার কিছু হয়নি।

তবে এই আনন্দময় মুহূর্তে তুমি ক্যাবিনে শুয়ে রয়েছে কেন? মা ফুল্লরা, কত সাধনার, কত কামনার সেই মাথুন দ্বীপ আমাদের সন্নিকটে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মাথুনে পৌঁছে যাবো। চলো ফুল্লরা, বাইরে ডেকে চলো। সবাই সেখানে

দাঁড়িয়ে মাথুন দ্বীপটাকে লক্ষ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবো। ওঠো ফুল্লরা, ওঠো মা মনি।

ক্যাপ্টেন আরফিনের কথা অমান্য করার মত ফুল্লরার মনোবৃত্তি ছিলো না, তাই সে উঠে পড়লো এবং ক্যাপ্টেন আরফিনের সঙ্গে এগুলো। পিতার মতই স্নেহ পরায়ণ ছিলেন ক্যাপ্টেন হুই। ফুল্লরার সমস্ত মনেপ্রাণে প্রশাদ্ধা ভরে উঠতো তার ব্যবহারে। সমস্ত মানঅভিমান দূর হয়ে যেতো কোথায়। চুপ করে থাকতে পারতো না ফুল্লরা যখন তিনি হেসে কথা বলতেন।

আজও ফুল্লরা ক্যাপ্টেন আরফিনের কথায় অবহেলা করতে পারতো না। কিন্তু ডেকে উপস্থিত হয়ে দেখলো ফুল্লরা, লুসি জাভেদের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

উভয়ে তাকিয়ে আছে সম্মুখের দিকে।

দূরে ভাসমান একটি দ্বীপ যেন এগিয়ে আসছে তাদের জাহাজের দিকে। হঠাৎ ফুল্লরার। দৃষ্টি চলে গেলো অদূরে, সে দেখতে পেলো ক্যাপ্টেন আরফিনের সহকারী যুবক নাবিক ডিরোমা বেশ কিছুটা দূরে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে জাভেদ ও লুসিকে লক্ষ করছে। তার চোখেমুখে একটা হিংসাত্নক ভাব ফুটে উঠেছে। ব্যাপারটা ফুল্লরার কাছে নতুন মনে হলো, কারণ সবাই যখন মাথুন দ্বীপ লক্ষ করে আনন্দে উৎফুল্ল তখন ঐ একটিমাত্র ব্যক্তিই শুধু অন্য কিছু নিয়ে ভাবছে।

ফুল্লরা আশঙ্কিত হয়ে উঠলো, তবে কি ডিরোমা জাভেদের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। একটা ভীতিভাব ফুটে উঠলো ফুল্লরার মুখমন্ডলে। সে তখন ধীর পদক্ষেপে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো। এক পাশে লুসি অপর পাশে ফুল্লরা।

আরফিন হুইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো–নাবিকগণ, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা একেবারে মাথুন দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছি।

জাহাজখানা ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মাথুন দ্বীপের সন্নিকটে কোনো ডুবন্ত পাহাড় থাকতে পারে, কাজেই জাহাজ এলুনকে অত্যন্ত সাবধানে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। হঠাৎ কোনো ডুবন্ত পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজের ক্ষতি হতে পারে, এ কারণেই ক্যাপ্টেন আরফিন এই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলো।

জাহাজখানা যে মুহূর্তে মাথুনে নোঙ্গর করতে গেলে ঠিক ঐ সময় বৃহদাকার একটি কচ্ছপ ভেসে উঠলো জাহাজের সম্মুখে।

ক্যাপ্টেন আরফিন ভাবতেও পারেননি মাথুন দ্বীপের কাছে পৌঁছে এমন একটা বিপদ আসতে পারে। কচ্ছপটির আকার প্রায় জাহাজ এলুনের সমান। বিরাট কচ্ছপটির নিকটে বাধা প্রাপ্ত হলেন ক্যাপ্টেন আরফিন।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি।

নাবিকগণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই, তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো এবং গোলাগুলি নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু বৃহৎ কচ্ছপটি এত গোলাগুলিতেও কাবু হলো না। বিরাট দেহটা উঁচু করে পর্বতের মত জাহাজের ঠিক সম্মুখভাগে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন নিজেও রাইফেল নিয়ে গুলী ছুঁড়তে শুরু করলেন কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। কচ্ছপটি দৈত্যরাজের মত এগিয়ে আসছে চার পায়ে ভর করে।

লুসি ছুটে এলো পিতার পাশে, বললো সে–বাবা তুমি কি মনে কর এটাও সেই ধরনের জীব?

না, মোটেই এটা সেই বৃহদাকার জীবটার মত না। এটা সামুদ্রিক কচ্ছপ। এরা তেমন কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না তবে ওদের পিঠের খোল অত্যন্ত শক্ত। জাহাজের কোনো অংশে ধাক্কা খেলে জাহাজ ফেসে যেতে পারে।

হঠাৎ দেখা গেলো কচ্ছপটা বসে পড়লো এবং পা চারখানা গুটিয়ে নিলো পেটের মধ্যে। ক্যাপ্টেন হুই আনন্দধ্বনি করে উঠলেন-জাভেদ! আমাদের দুর্ধর্ষ জাভেদ তার বিষাক্ত তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেছে কচ্ছপটাকে ঐ দেখো লুসি কচ্ছপটির কণ্ঠদেশে সেই বিষাক্ত তীরফলক বিদ্ধ হয়ে আছে......সাবাস জাভেদ, সাবাস! আশেপাশে তাকালেন তিনি কিন্তু জাভেদকে দেখতে পেলেন না। দৃষ্টি তার চলে গেলো দূরে জাহাজের পেছন অংশের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন সেখানে জাভেদ তার প্রিয় তীর-ধনু হাতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে তার খুশির উচ্ছ্বাস।

লুসি আর ফুল্লরাও লক্ষ করলো জাভেদকে।

হাতছানি দিয়ে ডাকলো লুসি–এসো, এখানে এসো তুমি!

ফুল্লরা কোনো কথা বললো না।

লুসি ফুল্লরার দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে আনন্দভরা গলায় বললো–দেখলে ফুল্লরা, জাভেদ এবারও বাবাকে জয়যুক্ত করলো।

ক্যাপ্টেন আরফিনকে বড় দীপ্তময় লাগছিলো। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি বারবার তাকাচ্ছিলেন জাভেদের দিকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তিনি যে হারিয়ে ফেলেছেন এ মুহূর্তে।

*

বহু সাধনার, কামনার আকাঙ্ক্ষিত মাথুন দ্বীপে পা রাখলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এবং তার দলবল।

লুসি আর ফুল্লরা যে মোটরবোটে চেপে মাথুন দ্বীপে অবতরণ করলো তার চালক হয়েছিলো ডিমরা। সে নিজেকে বাহাদুর এবং শক্তিশালী বলে সবার কাছে প্রমাণিত করতে চায়, বিশেষ করে লুসি এবং তার বাবা ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের কাছে।

দ্বীপে বোট পৌঁছলে লুসির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো ডিরোমা-এসো লুসি, আমার হাত ধরে নেমে এসো।

লুসি বললো–তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি নামতে পারবো। কথাটা বলে লুসি লাফিয়ে নেমে পড়লো মাথুনের মাটিতে। তারপর সে হাত বাড়ালো ফুল্লরার দিকে–এসো ফুল্লরা।

ফুল্লরা লুসির হাতে হাত রেখে নেমে দাঁড়ালো মোটরবোট হতে।

ততক্ষণে অন্যান্য সবাই জাহাজ ছেড়ে স্পীডবোটযোগে মাথুন দ্বীপে এসে পৌঁছে গেলো।

অদূরে বালুভূমিতে অবহেলিত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিরাটদেহী কচ্ছপটা। ফুল্লরার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, ভাবে ফুল্লরা বিশাল সাগরের

তলদেশে না জানি কত অজানা ভয়ংকর জীব বাস করে যা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়।

লুসি বলে–কি ভাবছো ফুল্লরা? চলল, বাবা অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

হাঁ চল। বললো ফুল্লরা।

ফুল্লরা পা বাড়ালেও তার দৃষ্টি ছিলো জাভেদের দিকে। কোথায় সে?

জাভেদের পিঠে তীর-ধনু আর তূণ।

এগিয়ে চলেছে সে আরফিন হুইয়ের পাশে পাশে।

ডিরোমার হাতে রাইফেল।

কয়েকজন নাবিক অস্ত্র হাতে সবার অগ্রভাগে রয়েছে।

ক্যাপ্টেন আরফিনের হাতেও রাইফেল। তিনি সবাইকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। তার চোখেমুখে খুশির উচ্ছলতা, এই সেই দ্বীপ যে দ্বীপের মাটিতে মিশে আছে অসংখ্য স্বর্ণকণিকা।

কিছুটা অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো বৃক্ষলতাগুল।

থোকা থোকা ফুল আর ফুল ফটকে আছে।

জীবজন্তুর দূরের কথা, একটি পাখীও নজরে পড়ছে না।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই ডায়রীখানা বের করে নিলেন। ডায়রীতে স্পষ্ট পথের নির্দেশ দেওয়া আছে।

আরফিন হুইয়ের পাশে ডিরোমা, তার সঙ্গেই কথাবার্তা বলছেন ক্যাপ্টেন হুই।

হঠাৎ একজন নাবিক চিৎকার করে বলে উঠলো–ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন সোনা! পায়ের তলায় মাটির সঙ্গে মেশানো সোনা......।

সবাই পায়ের তলায় তাকালো, বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো মাটির সঙ্গে চকচক করছে অসংখ্য বালুকণার মত স্বর্ণ। সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই দুহাতে মুঠা মুঠা মাটি তুলে নিয়ে মেলে ধরছেন চোখের সামনে। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন উজ্জ্বল দীপ্ত ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আনন্দভরা কণ্ঠে তিনি বললেন– পেয়েছি…পেয়েছি…….ডিরোমা পেয়েছি।……এই দেখো সোনা, শুধু সোনা আর সোনা……নাবিকগণ, তোমরা জাহাজ থেকে বস্তা আর থলে নিয়ে এসো। যত পারো বস্তা আর থলে ভর্তি করে নিয়ে চলো। সোনার অভাব আর থাকবে না আমাদের নাগারুহী রাজ্যে। গরিব থাকবে না একজনও……

কিছু শাবল কোদাল ছিলো নাবিকদের সঙ্গে, তারা ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের নির্দেশমত মাটি কাটতে শুরু করে দিলো। বস্তা ভর্তি করতে লাগলো আরফিন হুইয়ের সঙ্গীসাথিগণ।

আনন্দে অধীর সবাই।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই নিজে কোদাল চালাচ্ছেন।

লুসি ছুটে এলো-বাবা, তুমি একি করছো? একি করছো……কোদাল চালাচ্ছো তুমি নিজের হাতে? বাবা, এত স্বর্ণ তুমি কি করবে বাবা?

আমাদের দেশের মানুষ বাঁচবে। মা লুসি, স্বর্ণ কোনোদিন মূল্যহীন হয় না। আমার এলন ভর্তি করে মাখুনের সোনা মেশানো মাটি নিয়ে যাবো দেশে, তারপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটি থেকে সোনা বের করে বিক্রি করবো।

তারপর? বললো লুসি।

যে অর্থ আসবে তা দিয়ে আমি আমার দেশে গড়ে তুলবো অনাথ গরিব জনগণের জন্য হসপিটাল, স্কুল, কলেজ আর মসজিদ…

বাবা, তোমার মনে এতো বাসনা লুকানো আছে?

হাঁ মা! হসপিটালে দুঃস্থ জনগণ চিকিৎসা পাবে যারা পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরছে, ওষুধ কেনার যাদের সামর্থ্য নেই, আমি তাদের জন্য

হস্‌পিটাল তৈরি করবো। একটি নয়, দুটি নয় শত শত হস্‌পিটাল আমি গড়ে দেবো এ পৃথিবীর শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে……

তারপর বাবা?

স্কুল গড়ে দেবো, হাজার হাজার স্কুল। পৃথিবীর বুকে অগণিত মানুষ অর্থের অভাবে সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে না, অশিক্ষা কুশিক্ষায় তারা অমানুষ হয়ে গড়ে উঠছে। তারা জীব-জানোয়ারের মত বেড়ে উঠছে। সত্যিকারের মানুষ তৈরি করতে হলে চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান…….

বাবা, তুমি সত্যি অপূর্ব, অপূর্ব তোমার বাসনা। শেষ কথাটা আমিই সমাধা করি। মজিদ বানাবে যেন অমানুষগুলো মানুষে পরিণত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, যেন তারা জীবনটাকে পরিপূর্ণতায় ভরে তুলতে সক্ষম হয়?

হাঁ, হাঁ মা, ঠিক তাই। যতক্ষণ না আমরা সেই দয়াময়ের দয়ার গুণগান করতে সক্ষম হবে ততদিন আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে না। এই মাটি আর সোনা মিশে এক হয়ে আছে এটাও তারই দান। সাগরের জলরাশি তারই মহিমা, বিশাল আকাশ সূর্য, তারকারাজি। যা কিছু আছে সবই তার সৃষ্টি, কাজেই যতক্ষণ আমরা সেই মহিমাময়কে স্মরণ না করবো। ততক্ষণ কোনো কাজেই সফলতা আসবে না।

বাবা! আমাকে দাও তোমার কোদালখানি, আমি তোমার বস্তাটা ভরিয়ে দিচ্ছি। তুমি কষ্ট করবে তা আমাদের সইবে না। ঐ দেখো জাভেদ কত মাটি কেটে স্তুপ করেছে।

তাই তো মা, আমি এতক্ষণ জাভেদকে লক্ষই করিনি। মা লুসি, তুমি এবং ফুল্লরা বিশ্রাম করো। অনেকটা পথ এসেছে, তোমরা বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে।

বাবা, তুমি যে কি বলো! তুমি সব সময় নিজেকে সবল মনে করো আর আমাদের মনে করো আমরা বড় কচি, দুর্বল। তোমার বস্তা আমি নিজের হাতে ভরিয়ে দেবো তারপর বিশ্রাম।

লুসি, আজই তো কাজ শেষ হবে না মা। বেশ কিছুদিন তো মাথুন দ্বীপে আমরা আছি। যদি পারো তখন আমাদের সাহায্য করে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো লুসি, তারপর বললো–বাবা, আগুন জ্বেলে কি হবে? এই নির্জন দ্বীপে একজন তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তিনি সেই অসীম ক্ষমতাবান দয়াময়।

আমি ভয় পেয়ে আগুন জ্বালতে বলছি না মা লুসি। আগুন আমাদের দেহটাকে গরম রাখবে। দেখছো না কেমন হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নাবিকদের লক্ষ করে বললেন আরফিন হুই-তোমরা যেখানে মাথুনের মাটিতে কোদালের আঘাত হানছে তাতে মনে হচ্ছে আজকেই সব মাটি তোমরা বস্তায় তুলে নেবে।

বাবা, একটু পূর্বে তুমিও কিন্তু ঠিক তেমনিভাবেই কোদাল চালাচ্ছিলে। সত্যি তোমার কোদাল চালানো দেখে আমি অবাক না হয়ে পারিনি……

কারণ?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিলো ডিরোমার চেয়েও তুমি শক্তিশালী…..

লুসির কথাটা ডিরোমার কানে শুধু বর্ষণ করলো, কারণ ডিরোমা জানে লুসি তাকে বড় অবহেলা করে। পিতার শক্তির সঙ্গে তার শক্তির তুলনাটা মন্দ লাগলো না ওর কাছে। ডিরোমা কোদাল চালাচ্ছিলো, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হেসে বললেন বৃদ্ধ হয়েছি বলে শক্তি হারাইনি মা লুসি। চলো সবাই কাজ বন্ধ করে বিশ্রামের আয়োজন করি।

অস্তগামী সূর্যের লাল আলোকরশ্মি মাথুন দ্বীপটাকে রাঙা করে তুলেছে। নীরব নিঝুম দ্বীপখানা এলুনের যাত্রীদের হইহুল্লোড়ে ভরে উঠেছে। সবাই তখনও কোদাল শাবল চালাচ্ছে, বস্তা আর থলে ভর্তি করছে সোনা মেশানো মাটি দিয়ে।

লুসি এসে জাভেদের হাত চেপে ধরলোক্ষান্ত হও হীরো, আরও নয় আজ!

জাভেদ ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের কথাগুলো শুনতে পায়নি। সে বেশ দূরে মাটি কাটছিলো, অবাক হয়ে তাকালো সে লুসির মুখের দিকে।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন আরফিন এসে পড়েছেন তাদের পাশে, তিনি বললেন- কোদাল রেখে চলো এবার বিশ্রামের আয়োজন করা যাক।

দলবল সবাই কোদাল-শাবল গুছিয়ে নিলো।

মাটিভরা বস্তাগুলো গুছিয়ে রাখলো এক জায়গায়।

পড়ন্ত সূর্যের আলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে।

সবাই মিলে একটি টিলার পাশে বিশ্রামের আয়োজন করলো। খাবার তাদের সঙ্গেই। ছিলো, তাই তারা কোনো অসুবিধা বোধ করলো না।

শুধু খাবার নয়, বিছানার জন ত্রিপল এবং খাবার পানিও সঙ্গে নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই। সবাই মিলে খাবার পালা, যে যার খাবার তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

ফুল্লরা জাভেদের পাশে বসে খাচ্ছিলো।

লুসি খাবার তুলে নিয়ে ফুল্লরা আর জাভেদের মাঝামাঝি বসে পড়ে বললো— আমি কিন্তু তোমাদের খাবারে ভাগ বসাবো না। আমার খাবার আমি সঙ্গে এনেছি……বরং তোমরা নিতে পারো।

ফুল্লরা বললোনা, আমার খাবার যথেষ্ট আছে।

জাভেদ কোনো কিছু বললো না।

ক্যাপ্টেন আরফিন দুই খেতে খেতে বললেন–ডিরোমা, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে! আমি মাথুন দ্বীপের মাটিতে বসে পানাহার করছি। আজ তোমরা সবাই আমার পাশে আছো। আমার বন্ধুর মত আমি একটা নই। ডিরোমা, তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি তাই সব সময় তোমাকেই কাছাকাছি স্থান দিয়ে এসেছি।

জাভেদ আপনার হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছে, তাই না? ডিরোমা চায়ের মগটাতে চুমুক দিতে দিতে বললো।

হাঁ তা সত্য, কারণ তারই জন্য মাথুনের মাটিতে পা রাখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ডিরোমা, এ কথা তুমিও অস্বীকার করতে পারো না। জাভেদ আমার

পুত্রের চেয়েও অধিক...... ক্যাপ্টেন আরফিন দুইয়ের মুখমন্ডল দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ায় ডিরোমার মুখোভাব ক্যাপ্টেন আরফিন দুই লক্ষ করতে পারলেন না। ডিরোমার চোখ দিয়ে তখন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো যেন। ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের মুখে জাভেদের প্রশংসা তার সমস্ত মনকে বিষাক্ত করে তোলে। প্রথমে কিন্তু ডিরোমা জাভেদকে মোটেই হিংসা করতো না, তখন তাকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করেছিলো। যখন সে লক্ষ করলো ক্যাপ্টেন আরফিন হুই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে বীর পুরুষ হিসেবে তখন ডিরোমার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। তারপর জাভেদকে মিস লুসির হীরার আংটি দান তাকে আরও বেশি ক্রোধান্ধ করে তুললো। তার আসন দখল করে নিয়েছে জাভেদ।

হিংস্র জন্তুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ডিরোমা।

যেমন করে হোক জাভেদ অথবা আরফিন হুইকে সরাতে হবে। জাভেদকে সরালে সবচেয়ে ভাল হয়, তারপর ক্যাপ্টেন আরফিন হুই-তাকেও সরানো দরকার, নইলে জাহাজ এলুনের মালিক হওয়া যাবে না। শুধু এলুনের মালিক হওয়ার সাধটই তার মনে উদয় হয়নি, এলুন এবং লুসি দুটোই তার চাই।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই সহকারীদের নিয়ে গাছের শুকনো পাতা আর শুকনো ডাল সংগ্রহ করলেন, তারপর আগুন জ্বালালেন। শুকনো ডালপালায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

আশ্চর্য, একটি কীটপতঙ্গও আগুন দেখে ছুটে এলো না।

রাত বাড়ছে।

সবাই নিজ নিজ কম্বলে গা এলিয়ে দিয়েছে।

হিমেল হাওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে।

*

ভোর হলো।

পূর্বাকাশে নতুন সূর্য উঁকি দিলো আবার নতুন রূপ নিয়ে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের দু'চোখে বিস্ময়ভরা সোনালী আলোর ছটা। সূর্যের আলোতে মাথুন দ্বীপের মাটি চকচক করছে, অসংখ্য স্বর্ণকণা ছড়িয়ে আছে মাটির সঙ্গে।

সবাই জেগে উঠলো।

ফুল্লরা লুসি ডিমোরা–কিন্তু জাভেদ কোথায়?

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের চোখ দুটোর দীপ্তিময় আলো দপ্ করে নিভে গেলো যেন। শক্ত দড়ির মত কপালের রেখাগুলো ফুটে উঠলো। চারপাশে তাকিয়ে বললো—আশ্চর্য, সবাই আছে কিন্তু জাভেদ কোথায়?

লুসি আর ফুল্লরা পাশাপাশি শুয়েছিলো।

ফুল্লরার চেহারায় কান্নার ভাব, চোখ দুটো ছলছল করছে।

লুসি চিৎকার করে ডাকলো-হীরো হীরো...জাভেদ জাভেদ......লুসি ওর নাম দিয়েছিলো হীরো, তাই মাঝে মাঝে হীরো বলে ডাকতো।

ফুল্লরা এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আরফিন তুই বললেন–এত ঘাবড়াবার কিছু নেই। চলো সবাই মিলে তাকে খুঁজে দেখি।

নাবিকগণ সবাই ছুটলো এদিক সেদিকে।

ডিরোমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বললেন–ডিরোমা, তুমি অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও জাভেদের সন্ধান করো। ওকে খুঁজে না আনা পর্যন্ত আমরা মাটিতে কোদাল চালাতে পারবো না।

ডিরোমা বললো–মোটেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে তার সন্ধান করা।

কারণ?

আমার পক্ষে বলা উচিত হবে না।

ডিরোমা!

হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, আমি পারবো না তার খোঁজ করতে।

এ কথা বলতে পারলে ডিরোমা? তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেছো জাভেদের জন্যই আজ আমরা সবাই মাথুন দ্বীপে পৌঁছতে পেরেছি।

জানি এবং ভুলে যাইনি কোনো কথা।

তবে তার খোঁজ করতে এত উদাসীন কেন তুমি?

লুসি বললো–বাবা, ওর কোনো দরকার হবে না, চলো আমরাই তার সন্ধান করি?

তাই চলল! ক্যাপ্টেন আরফিন হুই আর লুসি বনের দিকে এগুলো।

ফুল্লরাও আচলে চোখ মুছে তাদের সঙ্গে চললো।

লুসি বললো—বোন, তোমার কষ্ট হবে।

না, আমার কোনো কষ্ট হবে না। বললো ফুল্লরা।

লুসি বললো—এসো তাহলে।

ডিরোমা একাই কোদাল চালিয়ে চললো।

আর অন্যান্য সবাই জাভেদের সন্ধানে প্রবেশ করলো গহন জঙ্গলে।

গভীর জঙ্গল।

নানা ধরনের ফলবৃক্ষও নজরে পড়লো তাদের।

একপাশে পর্বতমালার মত উঁচুনীচু টিলা সারিবদ্ধভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন বললেন তোমরা দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাও। সবার দৃষ্টি তাহলে চারদিকে থাকবে। জাভেদকে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন হবে না।

কিন্তু বহু অনুসন্ধান চালিয়েও জাভেদের সন্ধান মিললো না।

হঠাৎ একজন নাবিক উচ্চকণ্ঠে আরফিন লুইকে লক্ষ্য করে বললো–ক্যাপ্টেন, এই দেখুন এখানে ভিজা মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এবং মিস লুসি এক রকম প্রায় ছুটেই গেলেন সেখানে, তাদের সঙ্গে দলবল সবাই ব্যস্ততার সঙ্গে এগিয়ে এলো। ঝুঁকে পড়লেন আরফিন হুই। হাঁ, মানুষের পায়ের ছাপই বটে, তবে কিছুটা অস্বাভাবিক, আংগুলগুলো অনেক লম্বা বলে মনে হচ্ছে।

আরফিন হুই বললেন–এ পায়ের ছাপ বিস্ময়কর। এটা কিছুতেই জাভেদের পায়ের ছাপ হতে পারে না।

ফুল্লরার মুখমন্ডল মুহূর্তে কালো হয়ে উঠলো, সে মনে করেছিলো ঐ পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই জাভেদের হবে কিন্তু ফুল্লরা লক্ষ করলো ঐ ছাপ অনেক বড়, পায়ের নখ বসে গেছে মাটির মধ্যে তা স্পষ্ট বোঝা যাছে।

আরফিন হুই তাকালেন লুসির মুখের দিকে।

লুসি পিতার মুখোভাব লক্ষ করে অবাক হলো, কারণ সে মুখে ছিলো বিস্ময় আর ভীতির চিহ্ন।

লুসি অবাক কণ্ঠে বললো–বাবা, তুমি এ পদচিহ্নে বেশ আতঙ্কিত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে?

তোমার অনুমান সত্য মা লুসি। এ পদচিহ্ন আমাকে শুধু বিস্মিত হতবাকই করেনি, আমি ভীষণভাবে বিচলিত হয়েছি। যদিও পদচিহ্ন মানুষের তবুও আমি আশ্চর্য হয়েছি। কারণ মাথুন দ্বীপে মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জীবজন্তু নেই

বলে আমরা জানি এবং আমার বন্ধুর ডায়রীতেও সে কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে।

হাঁ তা সত্য। তাহলে এ পদচিহ্ন কার? জাভেদই বা গেলো কোথায়?

লুসির কথায় ফুল্লরা আরও উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো।

ক্যাপ্টেন আরফিনের দলবল সবাই পরস্পর এ মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। কেউ যেন এগুতে সাহসী হচ্ছে না আর।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই পদচিহ্ন লক্ষ্য করে এগুতে শুরু করলেন।

বনের এই অংশে জলাশয় থাকায় মাটি স্যাঁতস্যাঁতে ছিলো, তাই পায়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো।

কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পর আর পদচিহ্ন দেখা গেলো না। শুকনো পাতা আর আগাছায় পদচিহ্ন মিশে গেছে। তবুও এগিয়ে চললেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই ও তার দলবল। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত মনে এগুচ্ছে। লুসি আর ফুল্লরা সকলের মাঝামাঝি চলছিলো। ফুল্লরার মুখমন্ডল বিষণ্ন মলিন। মনে মনে সে করুণাময়কে স্মরণ করে চলেছে।

গোটা জঙ্গলটা তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও জাভেদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেলে না।

ফিরে এলেন আরফিন হুই দলবলসহ।

ডিরোমা কয়েক বস্তা মাটি সংগ্রহ করে ফেলেছে।

ওরা ফিরে এলো বললো ডিরোমা–তোমরা শুধু শুধু হয়রান হচ্ছো। আমি দেখো কত স্বর্ণসহ মাটি সংগ্রহ করেছি।

আরফিন হুই ডিরোমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো–সাবাস ডিরোমা, তুমি একাই দেখছি রাজ্যজয়ের আনন্দ লাভ করেছো।

ক্যাপ্টেন, আপনার আনন্দ হচ্ছে না? বললো ডিরোমা।

হ্যাঁ হচ্ছে.....তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন তিনি জাভেদের অন্তর্ধান আমার সমস্ত আনন্দ বিনাশ করে দিয়েছে। তুমি কি একটুও ভাবছো না ডিরোমা?

ভাবছি কিন্তু তার চলে যাওয়ার কারণে চিন্তিত হবার কিছু নেই।

তার মানে?

মাথুন দ্বীপের সঙ্গে কোনো পথ নেই যে পথে সে মাথুন দ্বীপ ত্যাগ করতে পারবে।

এ কথা সত্য তবুও স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। শোন ডিরোমা, আমি মনে করেছিলাম এ দ্বীপে কোনো জনপ্রাণী নেই কিন্তু বিস্মিত হয়েছি আমরা। সবাই আমরা দেখেছি মানুষের পায়ের ছাপ। তবে সাধারণ মানুষের নয়। অসাধারণ কোনো আশ্চর্যজনক মানুষের পদচিহ্ন,

ডিরোমা বললো—জাভেদের পায়ের দাগও তো হতে পারে?

বললেন আরফিন হুই-না, তার পায়ের ছাপ নয়। এই পায়ের ছাপটা বিস্ময়কর।

ডিরোমার চোখেমুখে একটা চিন্তার ভাব ছড়িয়ে পড়লো। বললো সে–কোনো গরিলা বা ঐ ধরনের কোনো জীবের পদচিহ্ন হবে। সাগরতলে নানা জীবের বসবাস আছে......

তা আমি জানি ডিরোমা কিন্তু এটা সাগরতলের কোনো জীবের পদচিহ্ন নয়, মানুষের পা। আমি তাই তো বেশি অবাক হয়েছি। শুধু পায়ের ছাপ নয়, মাটিতে নখের দাও স্পষ্ট দেখেছি।

ঐদিন সেই পায়ের ছাপ নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা চললো, অপরদিকে জাভেদের অন্তর্ধান নিয়ে সবার গভীর উদ্বেগ-না জানি সে কোথায় গেলো, কেমন আছে!

ফুল্লরাকে কোনো রকমে সান্ত্বনা দিতে পারছেন না ক্যাপ্টেন আরফিন হুই।

লুসিও কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। জাভেদের কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছে বারবার।

ডিরোমা হাসছিলো মুখ টিপে।

একজন নাবিক বললো–জাভেদ অন্তর্ধান হয়েছে তোমার কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না ডিরোমা? জানোনা তার দান অপরিসীম......

সঙ্গে সঙ্গে তার কলার চেপে ধরলো ডিরোমা-তোমরা সবাই মিলে জাভেদের আসন মজবুত করে তুলেছিলে। আমাদের দান বুঝি সামান্য? ঘুষি দিয়ে তোমার সবগুলো দাঁত খুলে দিতাম কিন্তু তা করবে না, কারণ ক্যাপ্টেন আমার ওপর ক্ষেপে উঠলেন। যাও ডন, যাও এখান থেকে। কিন্তু সাবধান, পুনরায় জাভেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে না। একটা কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি বড় বেখাপ্পা লাগে আমার কাছে।

চলে গেলো নাবিকটি ডিরোমার সম্মুখে থেকে।

ডিরোমা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

লুসি কিন্তু এতক্ষণ লক্ষ করছিলো সবকিছু, যদিও সে কিছু দূরে ছিলো এগিয়ে এলো দ্রুত পদক্ষেপে, বললো—ডিরোমা, তুমি ওকে অমন করে তাড়িয়ে দিলে কেন? আমি তোমার কথা সব শুনেছি। ভুলে যেওনা ডিরোমা বাবার জাহাজে তুমি স্থান পেয়েছো আমার জন্য। সেদিন আমিই বাবাকে বলেছিলাম ডিরোমার মত একটি লোককে রাখলে তোমার মন্দ হবে না। সে কথা ভুলে গেছো বুঝি?

না ভুলিনি মিস লুসি, তোমার সেদিনের কথাগুলো আজও আমার কানের কাছে মধু বর্ষণ করে। উঃ! কি উপকারটাই না সেদিন তুমি আমার করেছিলে। আর সেই কারণেই আমি তোমার মঙ্গল কামনা করে আসছি সর্বক্ষণ। মিস লুসি, তুমি কেন বুঝতে পারো না আমি তোমার হিতাকাক্ষী! ডিরোমার কণ্ঠস্বর ভাবগম্ভীর মনে হচ্ছিলো।

লুসি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি ডিরোমা কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে বিষধর সাপের মত মনে হয়। অবশ্য মনের কথা কোনো দিনই বাবাকে বলিনি, বললে হয়তো এলুনে তোমার স্থান হতো না এতদিন।

ডিরোমার চোখ দুটো শার্দুলের চোখের মত জ্বলে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে বললো ডিরোমা–মিস লুসি, তোমার অনুগ্রহ, কিন্তু এ কথা ভুলে যেও না তোমার বাবা বৃদ্ধ হতে আর বেশি দেরী নেই এবং এখন তিনি ভাল করেই জানেন আমাকে ছাড়া তার উপায় নেই।

তোমার কথাগুলো বাবাকে বলবো কি?

না, সময় হলে তিনিই তোমাকে বলবেন।

আমাদের কাছ থেকে বাবা বেশি দূরে নেই, তোমার কথাগুলো তার কানে যেতে পারে।

মিস লুসি, আমাকে যতখানি নির্বোধ মনে করো ঠিক ততখানি নই। কণ্ঠস্বর সাবধান রেখেই আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করছি। তোমার বাবার কানে আমার বা তোমার কথা পৌঁছবে না। তাছাড়া ওরা সবাই জাভেদকে নিয়ে ব্যস্ত। আরও সরে আসে ডিরোমা, চাপাকণ্ঠে বলে–মিস লুসি, তুমি কি একটুও বুঝতে পারোনা আমি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারি? তোমার আংগুল থেকে যখন মূল্যবান আংটিটা খুলে ঐ কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটার হাতে পরিয়েছিলে তখন ব্যথা পেয়েছি আমি। ঠিক আগুনে ঝলসে যাওয়া মাংসপিন্ডের মত আমার ভেতরটা কুকড়ে গিয়েছিলো।

ডিরোমা সেটা তোমার বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু না! তোমার ওসব কথা শোনার সময় নেই। চললাম আমি। লুসি ঘাড় বাঁকিয়ে একটু তাকালো, তারপর চলে গেলো বাবার পাশে।

সেদিন কোনো কথা হলো না বাবার সঙ্গে লুসির।

বাবাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন আর ব্যথিত মনে হচ্ছিলো। কত সাধনার, কত কামনার মাথুন দ্বীপ, যে দ্বীপের আশায় কত স্বপ্নইনা দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই। আজ তার চোখেমুখে একটা গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। লুসিও ব্যথা পায় মনে। বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে লুসি।

সেদিনও গত হয়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে মাথুন দ্বীপের বুকে।

সবাই নিজ নিজ শয্যা এবং খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত।

ফুল্লরা একপাশে অন্ধকারে বসে আছে। চোখ দুটো তার অশ্রুসিক্ত কত বিপদ থেকে উদ্ধার পেলো ও, কিন্তু এবার সে কোথায় হারিয়ে গেলো কোন অজানায়।

লুসির আনন্দ-দুঃখ পিতা এবং ফুল্লরার আনন্দ-দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে। ওদের চিন্তা ভাবনা তাকেও গ্রাস করেছে রাহুগ্রস্তের মত। তবে জাভেদের জন্য তারও যে দুশ্চিন্তা নেই তা নয়। জাভেদকে লুসি শুধু ভালই বাসে না তার প্রতি অনুরাগও আছে তার। মনের গহনে যত ব্যথাই থাক লুসি তা মুখোভাবে প্রকাশ করতে নারাজ, অবশ্য এটা তার স্বভাব বলা যায়। লুসি নিজকে স্বাভাবিক রেখে পিতাকে সান্ত্বনা দিতো, একমাত্র লুসির মুখের প্রসন্নতাই ক্যাপ্টেন আরফিন হুইকে সতেজ রাখতো। কন্যার মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছেন তিনি!

*

রাত বাড়ছে।

হিমেল হাওয়া তত ঠান্ডা মনে হচ্ছে।

আগুনের কুন্ডটা ভালভাবেই জ্বলছে, কারণ ক্যাপ্টেন আরফিন হুই আজ ঘুমাননি, তিনি রাইফেল হাতে সজাগ প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে আগুনের কুন্ডটার মধ্যে শুকনো কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা আবছা অন্ধকার মাথুনকে আলোময় করার চেষ্টা করছে যেন। ঝিঁঝির অশান্ত আওয়াজ তাও নেই এ দ্বীপে। জীবজন্তু এমন কি কীটপতঙ্গও নেই। আজও এ দ্বীপ মাথুন।

আরফিন হুই ভাবছেন জাভেদ গেলো কোথায়? কাল রাতে তারা সবাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিলেন, কারণ তারা সকলেই জানেন, এ দ্বীপে কোনো হিংস্র জীবজন্তু নেই এবং সেজন্যই এত নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছিলেন সকলের সঙ্গে ক্যাপ্টেন স্বয়ং। নইলে জাভেদ এমন করে পালাতে পারতো না। জাভেদের পায়ের ছাপের সঙ্গে সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের কোনো সংযোগ আছে কি? বন্ধুটির ডায়রীতে

মাথুন দ্বীপে কোনো জনপ্রাণীর বর্ণনা নেই তবে ঐ পায়ের ছাপ কার এবং কিসের? হুই অত্যন্ত গভীরভাবে এ নিয়ে ভাবছেন।

তার কানে ভেসে আসছে সাগরের গর্জন আর বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় ঘর্ষণের আওয়াজ। এমন একটা শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিলো যে শব্দ নির্জন মাথুন দ্বীপকে ভয়াবহ করে তুলছিলো। গত রাত সুখন্দ্রিায় কেটেছে, যদিও রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে তাদের প্রিয় জাভেদ তবুও কারও মনে কোনো দ্বিধা বা ভয় ছিলো না। আজ সবার মনে একটা আতংক, জাভেদ গেলো কোথায় এবং সেই অদ্ভুত পদচিহ্ন কোন্ প্রাণীর?

জাভেদকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই। কিন্তু তিনি মনের কাছে কোনো জবাব পাননি। উবু হয়ে একটা শুকনা কাঠ আগুনের কুন্ডটার মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালেন। অন্ধকারে দেখলেন কেউ যেন চলে গেলো বনের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই বলে উঠলেন–কে কে যায়? থামো, থামো বলছি, নইলে গুলী ছুঁড়বো। ক্যাপ্টেন তার রাইফেল উদ্যত করে ধরলেন।

ততক্ষণে অন্যান্য নাবিক এবং লুসি ও ফুল্লরাও জেগে উঠেছে।

সবাই ভীত আতঙ্কিতভাবে তাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন আরফিন শুইয়ের দিকে, তিনি জঙ্গলের দিকে রাইফেল উদ্যত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আগুনের লালচে আলোতে তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো।

লুসি ছুটে এলো পিতার পাশে, বললো–বাবা, তুমি গুলি ছুঁড়ো না। জাভেদও তো হতে পারে।

আমি তার পদশব্দ চিনি লুসি। তুমি সরে যাও আমি গুলি ছুঁড়বো, যদি জবাব না দেয়। এগিয়ে চলতে থাকেন ক্যাপ্টেন আরফিন হুই জঙ্গলের দিকে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের সঙ্গে এগুলো তার সহকারীদল। সঙ্গে তাদের পাওয়ারফুল টর্চ। টর্চের আলো ফেলে অগ্রসর হচ্ছে তারা।

ফুল্লরা আর লুসি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সমস্ত মুখমন্ডল ফ্যাকাশে আতংকগ্রস্ত মনে হচ্ছে। লুসি ভাবছে তার বাবা জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন। তার

সঙ্গে থাকা উচিত ছিলো কিন্তু ফুল্লরাকে একা ছেড়ে যাওয়াটা মোটেই সমীচীন হবে না। লুসি প্যান্টের পকেটে ছোট্ট পিস্তলটা রাখতো, এটা তার অনেক প্রয়োজনীয়। কখন কোন দরকার পড়ে যায় তাই, আজও এ মুহূর্তে লুসি তার পিস্তলখানা প্যান্টের পকেট থেকে বের করে নিলো।

ফুল্লরার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো লুসিভয় পেও না বোন, আমি আছি তোমার পাশে। নিশ্চয়ই বাবা ভুল করেছে, তার মনে অনেক চিন্তা ভাবনা রয়েছে কিনা।

ফুল্লরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো–বোন, জাভেদ আর ফিরে আসবে না তাহলে? ওকে আর পাবোনা?

ফুল্লরার কথাগুলো লুসিকে ব্যথিত করে তোলে, কারণ জাভেদের জন্য তার মনটাও হাহাকারে ভরে উঠেছে। একদিন ওরা ছিলো না, সেদিন লুসি নিশ্চিন্ত ছিলো। তার বাবাকে নিয়েই ছিলো শুধু তার সব ভাবনা আর আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে অজানা অচেনা এক তরুণকে নিয়ে। ওকে কেন এত ভাল লাগে বোঝে না লুসি। সে হারিয়ে যাওয়ায় ফুল্লরার ব্যথার চেয়ে কোনো অংশে কম নেই তার ব্যথা। তবুও মুখে প্রফুল্লতা নিয়ে লুসি নিজকে সবার কাছে সজীব রাখে।

লুসি সান্ত্বনা দেয়– এ দ্বীপ থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না ফুল্লরা, কাজেই জাভেদ ঠিক ফিরে আসবে।

সত্যি? সত্যি সে ফিরে আসবে?

হাঁ বোন।

কিন্তু……

না, কোনো কিন্তু নেই, দেখো আমি বললাম সে ফিরে আসবে।

তবে সে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলো কেন?

তুমি এতদিন তার সঙ্গে থেকেও তাকে তুমি চিনতে পারোনি? জাভেদ বড্ড খেয়ালী আমি ক'দিনেই বুঝেছি। হয়তো খেয়ালের বশে চলে গেছে কোথাও…… শেষ কথাটা চিন্তিত ব্যথিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো লুসি।

জঙ্গলে সবাই প্রবেশ করলেও ডিরোমা কিন্তু শুয়েই ছিলো তার শয্যায়। ক্যাপ্টেন হুই এবং সকলে মনে করেছিলেন ডিরোমা তাদের সঙ্গেই আছে কিন্তু সে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে কম্বলের তলায় নিজেকে গোপন করে রেখেছিলো।

এবার ডিরোমা কম্বলের তলা হতে কচ্ছপের মত মাথা বের করে দেখলো চারদিকে তাকিয়ে। কেউ নেই, সবাই ছুটেছে জঙ্গলের মধ্যে রইলো শুধু লুসি আর ফুল্লরা। কম্বল সরিয়ে বেরিয়ে এলো ডিরোমা। লুসি আর ফুল্লরা চমকে উঠলো। লুসি ভয় পেয়ে গেলেও বেশ সাহসের সঙ্গে বললো—কে? কে তুমি? ও ডিরোমা তুমি?

হাঁ, কেন, বড় ভয় পেয়ে গেছে বুঝি? বললো ডিরোমা।

না, তোমাকে দেখে ভয় পাবার মেয়ে আমি নই ডিরোমা। তোমাকে বাবা সমীহ করলেও আমি করি না।

আগুনের কুন্ডটা তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আগুনের লেলিহান শিখায় ডিরোমার চোখ দুটোকে শার্দুলের চোখের মত ভয়ংকর মনে হচ্ছিলো। লুসির পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো ডিরোমা চাপাকণ্ঠে বললো–লুসি, আমাকে তুমি বড় অবহেলা করলে কেন বলোতো? ফুল্লরা অবশ্য নতুন মেয়ে, কাজেই তার কথা আলাদা।

এ মুহূর্তে তোমার মুখে এসব কথা শুনতে রাজি নই, কারণ আমরা সবাই উদ্বিগ্ন আছি বাবা যতক্ষণ সঠিক সন্ধান নিয়ে ফিরে না আসেন ততক্ষণ কিছু আমার কানে প্রবেশ করছে না।

লুসি, তোমার বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ওপর তোমাদের জীবন নির্ভর করছে। ইচ্ছা করলে……

বলো থামলে কেন? বলল লুসি।

ইচ্ছা করলে তোমাদের নিখোঁজ করতে পারি যেমন-জাভেদ নিখোঁজ হয়েছে..

তাহলে তুমি, তুমিই তাকে নিখোঁজ করেছে ডিরোমা! বাবা এলে আমি সব বলে দেবো। তুমি জাভেদকে সরিয়েছে……বাবা তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

ফুল্লরা দু’চোখে ভয়, বিস্ময় আর উদ্বিগ্নতা ঝরে পড়ছে। সে রাতের অন্ধকারে অবাক দৃষ্টি মেলে শুনছিলো উভয়ের কথাবার্তা। ডিরোমাই কি তাহলে তার প্রাণপ্রিয় জাভেদের নিরুদ্দেশের কারণ!

লুসি পিস্তলখানা দক্ষিণ হাতে চেপে ধরে নাড়াচাড়া করছিলো।

ডিরোমার চোখ বার বার লুসির হাতের পিস্তলের দিকে চলে যাচ্ছিলো। হয়তো আরও কিছু বলতো ডিরোমা কিন্তু লুসির হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে ক্ষান্ত হলো সে।

লুসি বললো–বাবার সন্দেহ না হলেও আমি তোমাকেই সন্দেহ করি জাভেদের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে।

যাই বলো লুসি, জাভেদকে আমি সরাইনি এটা সত্য। তবে আমি জানি সে কোথায় আছে?

সত্যি! সত্যি তুমি জাভেদের সন্ধান জানো? ফুল্লরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ডিরোমার হাত দু’খানা।

লুসি বাঁকা চোখে কঠিন কণ্ঠে বললো—তবে কেন বলেনি সে কথা? তুমি জানো বলো কোথায় সে?

লুসি ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তলখানা চেপে ধরলো ডিরোমার বুকে। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো বলো কোথায় তুমি জাভেদকে লুকিয়ে রেখেছে যা এই মুহূর্তে প্রকাশ করলে?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো ডিরোমা। হাসি থামিয়ে বললো——তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম লুসি। জাভেদ কোথায় গেছে আমি জানবো কি করে! তবে সে এই দ্বীপেই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঁ হাত দিয়ে লুসির দক্ষিণ হাতে উদ্যত করে ধরা পিস্তলের মাথাটা নামিয়ে দেয় সে।

এমন সময় জঙ্গলের ভেতর হতে রাইফেলের গুড় ম গুড় ম আওয়াজ ভেসে আছে। নিস্তব্ধ দ্বীপখানা যেন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাইফেলের গুলীর শব্দে।

চমকে উঠলো লুসি।

ফুল্লরা ভীতভাবে লুসির কাঁধটা আঁকড়ে ধরে।

ডিরোমা বলে–ভয় পেও না, আমি তোমাদের জন্য রয়েছি।

লুসি তাকালো ডিরোমার মুখের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে আরও কয়েকবার রাইফেলের শব্দ হলো।

বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে ফুল্লরার।

লুসিরও মুখেও ছড়িয়ে পড়েছে ভীষণ একটা আতঙ্কের ছাপ। তার বাবা বড় দুঃসাহসী, এমনভাবে রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা ঠিক হয়নি। ইচ্ছা করছে বাবাকে ধরে টেনে বের করে আনে জঙ্গল হতে। হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় তখন কি হবে? লুসির চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ডিরোমা সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ও হাসবে তার দুর্বলতা লক্ষ করে। তাই লুসি নিজেকে শক্ত করে রাখে।

আবার সেই শব্দ গুড় ম গুড় ম......পরপর রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে। এবার শব্দটা আরও দূরে মনে হলো।

লুসি অধর দংশন করে।

তার ইচ্ছা হচ্ছে ছুটে যায় জঙ্গলে, বাবার যদি কোনো অমঙ্গল হয় তা সে সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু বাবা তো একা নন, তাঁর সঙ্গে আট-ন'জন সঙ্গী রয়েছে। বললো লুসি– ডিরোমা, তুমি বাবার প্রধান সহকারী, আর আমিই তোমাকে বাবার সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছিলাম। এটাই কি তোমার কর্তব্যের নিদর্শন? যাও, তুমি বাবার পাশে যাও।

তোমরা মানে......তোমাদের একা ফেলে যেতে পারি না, হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ......

তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না ডিরোমা, তুমি যাও.....

লুসির কথা শেষ হয় না, দু'জন নাবিক জঙ্গলের ভেতর হতে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।

লুসি আর ফুল্লরার দু'চোখে বিস্ময়।

ডিরোমাও বেশ অবাক হয়েছে তার মুখোভাব লক্ষ করলে বোঝা যায়। লোক দুজন। রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লুসির পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজন, ভীতকণ্ঠে একজন বললো—মিস লুসি, একটা অদ্ভুত মানুষ……একটা আশ্চর্য মানুষ, যার চোখমুখ নাক সব আশ্চর্য……

ডিরোমা বলে উঠলোকাপছো কেন, ভালভাবে বলো? আশ্চর্য মানুষ! সে আবার কেমন?

ডিরোমা, যদি তুমি দেখতে তাহলে তুমিও ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতে। অন্যান্য সবাই কে কোন্ দিকে পালিয়েছে ঠিক নেই..

লুসি বললো–বাবা! বাবা কোথায়?

তিনি সেই মানুষটাকে তাড়া করে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন।

বল কি নেতাসা! বাবা একা গেছে, আর সবাই পালিয়ে এসেছেন? তোমরাও পালিয়ে এসেছে?

নাবিকটির নাম নেতাসা। তাকে লক্ষ্য করে লুসি কথাগুলো বললো। অপরজনের নাম কোরাসুমিংস। সে ভয়ে কাঁপছিলো, কোনো কথা সে বলতে পারছিলো না।

মিস লুসি, তুমি যদি দেখতে তাহলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে। সে কি অদ্ভুত মানুষ! ক্যাপ্টেন কোনো দিকে না তাকিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন।

ডিরোমার চোখেমুখেও বিস্ময়।

সে ভেবে পাচ্ছে না জন প্রাণহীন দ্বীপে অদ্ভুত মানুষ এলো কোথা হতে। তার মুখমন্ডলেও একটা ভীতি ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

লুসি কি করবে ভেবে অস্থির হলো।

তার বাবা কি পাগল হয়ে গেছে, কেন সে অদ্ভুত ভয়ংকর লোকটাকে তাড়া করে গেলো। কেন সে সবার সঙ্গে চলে এলো না। বললো লুসি–বাবা গুলি ছুঁড়ছে, সে গুলি কি অদ্ভুত লোকটার শরীরে বিদ্ধ হলো না?

লোকটা এত দ্রুত হাঁটতে পারে, তার গতি বন্য শূকরের মত! ক্যাপ্টেন ছাড়াও অন্যান্যের গুলীও তার দেহে বিদ্ধ হলো না।

আশ্চর্য……বললো লুসি।

ফুল্লরার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে, চোখ দুটো তার বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। এসব যেন তার জীবনের নির্মম পরিহাস! এই কি ছিল তার ভাগ্যে। কোথায় ছিলো, কি ভাবে তার জীবনের শুরু আর কিভাবে শেষ হতে চলেছে। এ দ্বীপ থেকে ফিরে যাবে কিনা কোনোদিন তাও জানে না সে।

সেই অদ্ভুত লোকটাকে নিয়ে যখন ডিরোমা, লুসি, ফুল্লরা ও নাবিক দু'জন নানা ধরনের আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে জাভেদ ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ কাঁধে নিয়ে অগ্নিকুন্ডটার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার এলোমেলো বিক্ষিপ্ত চুল ছড়িয়ে পড়েছে ললাটে। তার দেহে রক্তের ছোপ, স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

লুসি আর ফুল্লরা একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো–জাভেদ তুমি! বাবার কি হয়েছে? বাবার কি হয়েছে জাভেদ।

জাভেদের দক্ষিণ কাঁধে ক্যাপ্টেন আরফিনের রক্তাক্ত দেহ আর বাঁ হাতে ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের রাইফেলখানা।

লুসি পিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো–বাবার কি হয়েছে জাভেদ?

জাভেদ ক্যাপ্টেন আরফিন হুইকে অগ্নিকুন্ডটার পাশে শুইয়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো তার পাশে!

ফুল্লরার চোখেমুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

ভুলে যায় ফুল্লরা লুসি আর ডিরোমার উপস্থিতি, দু'হাত বাড়িয়ে জাভেদের গলা জড়িয়ে ধরে উচ্ছল কণ্ঠে বলে–জাভেদ, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বলো কোথায় গিয়েছিলে? তোমার শরীরেও ক্ষত! কে তোমার আর বাবার এ অবস্থা করেছে? বলো, বলো জাভেদ, চুপ করে থেকো না?

জাভেদ বললো—ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ঐ লোকটা তুলে নিয়ে গিয়েছিলো কাঁধে করে, তাই আমি ওর হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারিনি। উঃ! কি ভীষণ শক্তি লোকটার শরীরে......।

লুসি ক্ষণিকের জন্য পিতার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো জাভেদের দিকে, দু চোখে তার বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। ওর কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো তার মন, কিন্তু পিতার করুণ অবস্থা তাকে ক্ষান্ত করলো ঐ মুহূর্তের জন্য। বললো লুসি বাবাকে ঐ লোকটা আক্রমণ করছিলো বুঝি? জাভেদ, বলো বাবার এ অবস্থা কেন?

ডিরোমা বললো–জাভেদকে তুমি না হিরো বলে ডাকো লুসি! তোমার হিয়োর এ অবস্থা কেন? সব বাহাদুরি এবার মিছে হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো ডিরোমা।

লুসি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ডিরোমার মুখের দিকে। কিন্তু ডিরোমার কথা নিয়ে ভাববার সময় এখন তার নয়। সে পিতাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো-বাবা! বাবা! চোখ মেলে তাকাও বাবা!

ক্যাপ্টেন আরফিন হুইয়ের সংজ্ঞা ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

লুসির দু'চোখ খুশিতে ভরে উঠলো, তাহলে তার বাবার মৃত্যু ঘটেনি! তার বাবা বেঁচে আছে! তাড়াতাড়ি পানির পাত্রে পানি ঢেলে বাবার চোখেমুখে দিতে লাগলো লুসি।

ফুল্লরা জাভেদের ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে দিচ্ছিলো তার ওড়নার আঁচল দিয়ে। সে যেন তার হারানো রত্ন ফিরে পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই এক সময় জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন–মা লুসি,, ভাবতে পারিনি এই জনপ্রাণীহীন দ্বীপে এমন একটি মানুষ আছে, যে রাক্ষসের চেয়েও ভয়ংকর......

বাবা, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো তারপর সব কথা শুনবো। বললো লুসি।

ক্যাপ্টেন হুই তবু উঠে বসার চেষ্টা করে বললেন—জাভেদ কই? জাভেদ কই মা? সে কি বেঁচে আছে?

হাঁ, হাঁ বাবা, জাভেদ বেঁচে আছে, সেই তো তোমাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে গভীর জঙ্গল থেকে।

জীবনে বহু কিছু দেখেছি……বহু কিছু দেখেছি মা লুসি, কিন্তু এমন মানুষ দেখিনি! উঃ! কি ভয়ংকর মানুষখেকো মানুষ।

[পরবর্তী বই জাভেদ ও নরখাদক]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০৪ মনিরার মুক্তি

পরবর্তী:

৮.০৬ জাভেদ ও নরখাদক »